পঞ্চম অধ্যায়

বালুরঘাটের নাটককার ও নাটক

ভাষা সৃষ্টির সাথে সাথে মানুষের করায়ত্ত হল প্রকাশ ক্ষমতা এবং তারপর মানব সমাজ বাস্তব কল্পনার সংমিশ্রণে রচিত গল্প কাহিনির মাধ্যমে মানুষকে আনন্দে উদ্বেলিত করার কৌশল আয়ত্ত করল। ক্রমে ক্রমে মানুষ বিভিন্ন কলা কৌশলের সাহায্যে উন্নত ভাবে সেই গল্পকাহিনি আরও চিত্তাকর্ষক উপায়ে উপস্থাপন করার ক্ষমতা লাভ করল। গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনকারী গল্পকাহিনিকে একটি বিশেষ আকার দেওয়ার চেষ্টা শুরু হল। যার ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আঙ্গিকে গানে, অভিনয়ে, মেক-আপের সাহায্যে এই ঘটনাগুলি পরিবেশিত হতে লাগল। আনন্দদানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম রূপে যা আমাদের সামনে উপস্থিত হল -সেটা হল নাটক। নাটক সমসাময়িক কালের সমস্যা, চিন্তা ভাবনা ও আন্দোলন, মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে রচিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের নাটকেও পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সংকট, ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে মালিক-শ্রমিক সংঘাত, কৃষিক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তিমানুষের পরিবর্তে শ্রেণীগত মানুষের প্রতিবাদ, সংগ্রাম, মুক্তি আন্দোলন, শিশুশ্রম, পণপ্রথা, ডাইনী প্রথা ইত্যাদি বিষয়গুলি নাটকের মধ্যে উঠে এসেছে। নাট্যচর্চা একটি চলমান প্রক্রিয়া। চলমান বর্তমানের সঙ্গে তার যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা আমরা অনুভব করিনা। যে গ্রুপ কোনো একটি অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে কয়েক বছর পরে উঠে গেল, অভিনীত নাটকের বহু পুরস্কার বিজয়ী যে পাণ্ডুলিপি অমুদ্রণে লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে থেকে একদিন হয়তো হারিয়েই গেল। তাঁদেরও একটি ভূমিকা ছিল নাট্য আন্দোলনে। কিন্তু ইতিহাসে তাঁরা থাকল না। বালুরঘাটে দশ থেকে বারো জন নাটককার রয়েছেন যাদের নাটকগুলি এখনও মুদ্রিত হয়নি। (নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পাঁচটি নাটক ছাড়া)। তাঁদের বিশেষ বিশেষ নাটক গুলির প্রতি সামান্য আলোকপাত করা হল-

মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮)ঃ

১৮৯৯ সালের ১৬ই জুন অধুনা বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের গালা গ্রামের হিন্দু বৈদ্য পরিবারে নাটককার মন্মথ রায়ের জন্ম। পিতা দেবেন্দ্রগতি রায়, মাতা সরোজিনী দেবী। পিতামহ গুরুগতি রায়, পিতামহী বরদাসুন্দরী দেবী। মন্মথ রায়ের পিতা দেবেন্দ্রগতি গালাতে তালুকদার ছিলেন এবং পরে নাটোরের সারকুটিয়া এস্টেটের (দিনাজপুরের পাটিচোরা বিভাগের) ম্যানেজার। তাঁরা ছিলেন সেনগুপ্ত। রায় তাঁদের উপাধী। নাটককার মন্মথ রায় পাঁচ ভাইবোন। তিনি একমাত্র পুত্র। ছোটবেলা থেকেই নাটককার মন্মথ রায়ের মনন ও জীবন চর্চা একটি শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, উদার পারিবারিক মন্ডলে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। গালা গ্রামে ছিল হিন্দু মুসলমানের সহবসস্থান তাই শিশু বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে অসম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে ওঠে। মন্মথ রায়ের পিতামহ গুরুগতি রায় বলিষ্ট দেহ ও সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য দারোগা হন। মন্মথ রায়ের বাড়ি দারোগা বাড়ি বলে পরিচিত ছিল। গালার পাঠশালায় সুস্থ সুবল ও সুন্দর দেহ গঠনের জন্যে খেলাধুলা প্রভৃতি নানা শরীর চর্চার উপর জোর দেওয়া হত। পিতার উপদেশে মন্মথ রায়ও ছাত্রাবস্থায় নিয়ত ব্যায়াম করে সুপুষ্ট দৃষ্টি নন্দন দেহ তৈরী করেছিলেন বলে ভাল ফুটবল, ক্রিকেট ও টেনিস খেলতে পারতেন।

অবিভক্ত বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের গালা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করলেও নাটককার মন্মথ রায় দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরকে গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর সামনে সাহিত্যের বিচিত্র বিভাগ থাকলেও তিনি নাটককে বেঁছে নিয়েছিলেন তার নিজের উপলব্ধিকে ব্যক্ত করার জন্য। উপলব্ধ জীবন বোধ, দেশপ্রেম, সামাজিক দায় থেকে তিনি রচনা করলেন একের পর এক নাটক একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গের আঙ্গিকে। ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা ও প্রথাবদ্ধতাকে মন্মথ রায় জাতীয় সংকটের মূল কারণ মনে করতেন। আদর্শহীনতা, নৈতিকমূল্যবোধের অভাব তাঁকে যন্ত্রণা দিত। তাই আজীবন তিনি জানতেন দেশকে গড়তে গেলে সবার আগে জানতে হবে নিজের দেশের কথা- আর নাটকই হচ্ছে তার উপযুক্ত মাধ্যম এই উপযুক্ত মাধ্যমটিকে সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি কেবল শ্রেষ্ঠ নাটককারই নন, বহু নাটককারের গুরুও তিনি। তাঁর কাছে অনেক নাটককারের হাতেখড়ি। তাই ‘‘তাঁকে বলা হয় শতাব্দীর নাট্যকার, ‘নাট্যকারদের নাট্যকার’, ‘যোদ্ধা নাট্যকার’, ‘জাত নাট্যকার’।’’[১] জীবনে একটিও বিদেশী নাটকের অনুবাদ করেননি, কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপ দেননি অথচ বাংলা নাট্যসাহিত্যকে দিয়ে গেছেন অজস্র গভীর মৌলিক উপলব্ধিজাত নাটক, জীবন মনস্ক মনোজ্ঞ পাঠ নাটক - পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্কের আঙ্গিকে। মন্মথ রায়ের উন্নত সাংস্কৃতিক মনোভাবের বিকাশ হয়েছিল সংস্কৃতিমনস্ক পারিবারিক রীতি থেকে তাদের পরিবারে সেই সময়ের প্রচলিত সাহিত্য, নাটক, নভেল, দৈনিক ও মাসিক পত্র থাকত পড়ার জন্য। মন্মথ রায় বই ও দৈনিক সংবাদপত্র খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ে তার সারকথা ডায়রীতে লিখে রাখতেন। শৈশব থেকেই তাঁর নাট্য প্রীতি বা সাহিত্য প্রীতি গড়ে ওঠেছিল তার মূলে তাঁর মায়ের ভূমিকা ছিল। তাঁর মা নভেল পড়তেন। তিনি যখন ছ’বছরের টুকুকে নিয়ে বালুরঘাটে রওনা দেন তখন তিনি গয়নার পোটলাটা নিতে ভুললেও বইয়ের পোটলাটা নিতে ভুলেননি। তাঁর মা ছিলেন স্বভাবকবি। তিনি মুখে মুখে কবিতা বাঁধতে পারতেন। গালা গ্রামে যাত্রাগান, সং ইত্যাদি হত। গালায় মন্মথ রায়ের বাড়ীর বাইরের আঙ্গিনায় শুধু যাত্রা নয় থিয়েটারও হয়েছে। নাটকের সঙ্গে মন্মথ রায়ের প্রথম যোগ গালায় নিজেদের বাড়িতেই । ‘‘গালাতে আমাদের পুরোহিত বংশের শ্রীযুক্ত সুরেন ঠাকুর কলকাতার শ্যামাদাস কবিরাজের ছাত্র ছিলেন। ছুটিতে গালাতে এসে তিনি রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকের অভিনয় করার জন্য মেতে উঠলেন। আমার কাকা ছিলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু। ঠিক হল, অভিনয় রাত্রে আমাকে শিশু ধ্রুব সাজান হবে। প্রায় সত্তর বছর আগে ‘গালা’র মত একটা ক্ষুদ্র গ্রামে বাঁশ আর তক্তা দিয়ে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার হতে যাচ্ছে না যাত্রা নয়। একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস ‘থিয়েটার’। এতে গোটা অঞ্চলের লোক মেতে উঠলো। যেদিন থিয়েটার হবে সেদিন আমার ঠাকুরমা বরদাসুন্দরী আমাকে কোলে নিয়ে বেঁকে বসলেন, আমাকে ধ্রুব সাজানো চলবে না। কে যেন তাঁকে বলেছে ঐ থিয়েটারে ধ্রুব মানে আমাকে বলি দেওয়া হবে। পিতা দেবেন্দ্রগতি এবং পিতামহ গুরুগতি পিতামহীকে বোঝালেন, না না এটা হতেই পারে না। কিন্তু তাতেও পিতামহী বরদাসুন্দরী আমাকে কোল থেকে নামালেন না। নামালেন তখন, যখন পিতৃব্য বীরেন্দগতি মায়ের পা ছুয়ে শপথ করে বললেন ‘ এরকম একটা কান্ড হতে পারে না এবং হবে না। এটা থিয়েটার, এতে সত্যি করে কেউ কাউকে মারে না, সবটাই লোক দেখানো হৈ হৈ রৈ রৈ খেলা মাত্র।’ মঞ্চে ধ্রুববেশে সেই আমার প্রথম অবতরণ কিন্তু অবতরণের পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়ায় সেটা আমার জীবনে একটা কাহিনী হয়েই রয়েছে’’[২]।

নাটককার মন্মথ রায় ছয় বছর বয়সে বালুরঘাটে আসেন। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মন্মথ রায়ের পিতামহ গুরুপতি রায় তাঁকে চিরতরে বালুরঘাটে নিয়ে চলে আসেন। বালুরঘাটে এসে তিনি ''১৯০৬ সালে ভর্তি হন গৌরীপালের পাঠশালায়। .. এর কিছুকাল পরে বালুরঘাটে প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ... মন্মথ পাঠশালা ছেড়ে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।''[৩] তখন থেকেই তাঁর শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষকদের নজর কারেন লেখা পাড়ায় তিনি ছিলেন মনোযোগী ও মেধাবী।

বালুরঘাটে এসে বাড়ির পাশে কালিমন্দির প্রাঙ্গনে মথুর সাহার যাত্রাদলের 'পদ্মিনী' পালা দেখে নয় বছরের মন্মথ রায় ১৯০৮ সালে লিখে ফেললেন দু'পাতার একটি নাটক 'রানী দূর্গাবতী'। ''যার যুদ্ধেই শুরু এবং অনেক আস্ফালন, অনেক পতন, অনেক উত্থানের পর যুদ্ধেই শেষ। হ্যাঁ, পঁয়ষট্টি বছর আগে লেখা রানী দুর্গাবতী'ই আমার প্রথম নাটক''[৪]। ১৯১৩ সালে বালুরঘাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন প্রত্নতাত্ত্বিক পন্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী। তিনি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ছাত্রদের দিয়ে রবী-দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকটি অভিনয় করান। ''রবী-দ্র নাথের 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়ে আমাকে অমল-এর ভূমিকায় নামান। ঐ ভূমিকা তৈরি করার কালে আমি যেন সত্যিসত্যি 'অমল' হয়ে গিয়েছিলাম। কেবলি মনে হত, সেই রাজা কবে আসবেন, ... সে রাজা ঈশ্বর। .... কিন্তু সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল ঐ নাটকের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম আমি জেনে নিতে পেরেছিলাম যে, এই জীবনই শেষ নয়- আর একটা জগৎ আছে-সেখানে জীবন দেবতা রাজা হয়ে বসে আছেন, তাঁর দিকেই এগিয়ে চলেছি আর দূরত্বও ক্রমে ক্রমে দূর হচ্ছে''[৫]। অমলের ভূমিকায় অভিনয় হল তাঁর দ্বিতীয় অভিনয়।

তাঁর মা সরোজিনী দেবী সাহিত্যানুরাগী নারী ছিলেন। ''তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতেন; যার একমাত্র পাঠক ছিল আমার বাবা''[৬]। তাঁরই উৎসাহে বাড়িতে সংগৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন নাটককারের নাটকের বই। গিরিশ ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসুর নাটক এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রাপালা প্রভৃতি। এগুলি সবই তিনি শৈশবে পাঠ করেছেন। কিন্তু ১৯১৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করলেও প্রতিটি বিষয়ে দ্বিতীয় হবার কারণ হিসেবে তাঁর পিতা বললেন-''এ যে হবে আমি জানতাম। পড়ার বই না পড়ে থিয়েটারের বই পড়লে এমন যবনিকাই পড়বে।''[৭] রাজশাহী কলেজে আই এ. পড়ার সময় ছাত্র অভিনেতা অন্তিম বোস এর পরিচালনায় গিরিশ ঘোষ এর 'পান্ডবগৌরব' নাটকে দন্ডীরাজ এর ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসিত হলেন। এর পর তিনি বন্ধুদের সহযোগে গড়ে তোলেন 'ভেকেশন ক্লাব'। এই ক্লাবের উদ্যোগে অতুলানন্দ রায়ের 'পানিপথ' ও ডি এল রায়ের 'নূরজাহান' নাটক এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল ক্লাব মঞ্চে অভিনয় হল, তিনি অভিনয় করলেন। এই ভাবেই তিনি নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন।

১৯১৯ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাশ করেন। কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে বি.এ. ক্লাসে পরীক্ষা দিতে গিয়েও তিনি পরীক্ষা না দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সে বছর সুভাষ চন্দ্র প্রমুখ দেশনেতার পরিচালিত 'গৌড়ীয়

সর্ববিদ্যায়তন' থেকে উপাধি পরীক্ষায় পাশ করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২২ সালে পিতার নির্দেশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করেন ১৯২৪ সালে এবং ১৯২৫ সালে বি. এল. পাশ করেন।

কলকাতা স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার সময় (১৯২০) তিনি বক্তিয়ার খলজির বঙ্গদেশ বিজয়ের ঐতিহাসিক কাহিনিকে ভিত্তি করে 'বঙ্গে মুসলমান' নামে একটি পঞ্চাঙ্কের নাটক লেখেন। তাঁর পরিচালনায় এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল ক্লাব হলে অভিনীত হয় 'ভেকেশন ক্লাব' এর প্রযোজনায়। নাটক শুরু হয় রাত দশটায় কিন্তু পরের দিন সূর্যোদয় হলেও নাটক শেষ হল না। লোকের দেখা হলেও নাটক শেষ হল না। ''লোকের দেখা মন্তব্য শুনতে লাগলাম নাট্যকার বটে, সূর্য উঠিয়ে ছেড়েছে''[৮]। দৃশ্য পরিবর্তন করতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন তিনি। প্রোভোস্ট ড. নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের অনুপ্রেরণায় তিনি নাটক লিখতে আগ্রহী হলেন, ''কিন্তু না, এবার আর বড় নাটক না। সূর্য ওঠে কিন্তু নাটক শেষ হয় না, এমন নাটকতো নিশ্চয় না। আর বিশেষ করে ঐ দৃশ্য বদলের হাঙ্গামা এবার কখনই নয়।''[৯] সাত দিনের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ যুগের পটভূমিকায় লিখলেন এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ দেড়ঘন্টার নাটক, নাম দিলেন 'অম্বা'। ১৯২৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 'মুক্তির ডাক' নাম দিয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় স্টার থিয়েটারে অভিনীত হল। প্রশংসায় নাটককার উজ্জল হয়ে উঠলেন। কিন্তু 'মুক্তির ডাক' নাটকটি জনপ্রিয় হল না। স্টার থিয়েটারের পরিচালক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নাটকটি ছেপে দেন। ''মুক্তির ডাক' শীঘ্রই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স প্রকাশ করলেন। ছোট্ট একখানি বই, দাম মাত্র ছয় আনা। আমার প্রথম মুদ্রিত নাটক-আমার নাট্যজীবনের প্রথম স্মরণীয় স্তম্ভ''[১০]। এই সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকরা 'মুক্তির ডাক' এর সুখকর সমালোচনা করলেন, প্রশংসা করলেন। ''দীর্ঘ নাটক লিখে যে সূর্যোদয়-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, সে সূর্য আমায় করেছিল ব্যঙ্গ। সেই ব্যঙ্গের ভয়ে এবার লিখলাম ক্ষুদ্র নাটক। এতেও হল সূর্যোদয়, হল আমার ভাগ্যের আকাশে।''[১১] 'মুক্তির ডাক'(১৯২৩) নাটক থেকেই তাঁর জয়যাত্রা শুরু। 'মুক্তির ডাক' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর প্রমথ চৌধুরী মন্মথ রায়কে পত্র যোগে জানিয়েছিলেন ''মুক্তির ডাক একখানি যথার্থ ড্রামা''[১২]। প্রবর্তক পত্রিকা লিখল ''মুক্তির ডাক নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। পড়িতে পড়িতে মেটারলিঙ্কের 'মনাভনার' কথা মনে পড়ে যায়। নাটকখানি ঠিক সেইরূপই। নাটকখানিতে পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে''[১৩]।

১৯৭৩ সালে 'মুক্তির ডাক' এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে বাংলা সাহিত্য একাডেমী যখন মন্মথ রায়কে একাঙ্কের প্রবর্তকের সম্মান ও 'মুক্তির ডাক' কে প্রথম বাংলা একাঙ্কের সম্মানে ভূষিত করে গুণীজনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করেন তখন তা নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়। ড: কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য একাঙ্ক নাটক নিয়ে গবেষণা সূত্রে যখন 'মুক্তির ডাকের' পূর্বে কোনো একাঙ্ক আছে কিনা গবেষণা করছেন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ঘেটে, তখন নাটককার নিজে বলেছেন ''খোঁজ, আরো খোঁজ, আমার কোনো দু:খ নেই, তুই সত্য ইতিহাস লেখ, সত্য নির্মম হলেও সত্য, সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক্‌। জয়স্তু।''[১৪] ড.কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে নাটককার মন্মথ রায় একদিন তাকে ডেকে বললেন,

‘‘আমি তোর বইটা সম্পূর্ণ পড়েছি। আমাকে কিছু মানুষ ভুল বুঝিয়েছিল, আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে। আমি খুশি মনেই তোকে আশীর্বাদ করছি। জয়োস্তু।’’[১৫]

১৯৭৩ সালে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিতর্কে নাটককার মন্মথ রায়ের পূর্বে বহু নাটককার ও নাটকের নাম উঠে আসলেও মন্মথ রায়ই শিল্প সম্মত একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক ও শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি একাঙ্ক নাটকের ‘মুকুটহীন সম্রাট’।

১৯২৬ সালের ২৩শে আগষ্ট মন্মথ রায় বালুরঘাট সদর মহকুমা আদালতে ওকালতির ব্যবসা শুরু করেন। তার পূর্বেই তাঁর বিবাহ হয় বগুড়ার স্বনামধন্য চিকিৎসক সুরেন্দ্র বক্সীর কন্যা তপোবালার সঙ্গে। নাটককারের দেওয়া নাম চিত্রলেখা। ১৯২৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। একদিকে ওকালতি অন্যদিকে জমিদারের ম্যানেজার দায়িত্ব পালন করেছেন।১৯২৭ সালে ২৪শে আগষ্ট তিনি অস্থায়ী ভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বাবার মৃত্যুর পর ১৯২৯ সালের ১১ই অক্টোবর মাহিনগর কাছারীর ম্যানেজার পদে স্থায়ী ভাবে যোগ দেন। ১৯৩১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ম্যানেজারী পদ ত্যাগ করেন। বালুরঘাটে তাঁর ওকালতি পর্ব ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। ইতিমধ্যে তার নাটককার হিসেবে খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক সাফল্যের সঙ্গ অভিনীত হচ্ছে। এই নাটকের আকর্ষণেই তিনি বালুরঘাটের ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে কলকাতায় চলে যান স্থায়ী ভাবে। কলকাতায় গিয়ে নিজগুণে সর্বত্র নিজেকে বিস্তারিত করলেন।

নাটককার ড. মন্মথ রায়ের নাট্যসাধনা নাটকে দুটি ভাগে ভাগ কর যায়-১. বালুরঘাট পর্ব, ২. কলকাতা পর্ব। নাটককার মন্মথ রায়কে নিয়ে পূর্বে বহু গবেষণা হয়েছে। আমি কেবল মাত্র তাঁর বালুরঘাট পর্বের সৃষ্টি কর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকব। ১৯৩৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বালুরঘাট ত্যাগ করেন। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি কর্মের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল।

১৯৩৮ সাল পর্যন্ত একাঙ্ক নাটকের তালিকা

(প্রথম বন্ধনীতে সাময়িক পত্রিকার কাল ও সংখ্যা, তৃতীয় বন্ধনীতে একাঙ্কটির পরিবর্তিত নাম ও প্রকাশ কাল দেওয়া হল)

১৩৩১ **মুক্তির ডাক** (জ্যৈষ্ঠ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, মন্মথ রায়ের প্রথম নাট্য গ্রন্থ),

ইলা- বাসন্তিকা শারদীয় স্বদেশ ১৩৭২,

দেবদাসী- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়শন কর্তৃক ২১-২২-১৯২৩ অভিনীত।

১৩৩২ রাজপুরী (শ্রাবণ, ভারতবর্ষ)
মাধুরী (আশ্বিন, সবুজপত্র)

যজ্ঞফল (অগ্রহায়ন, সবুজপত্র)
রথচক্র (মাঘ, ভারতবর্ষ)
কালরাত্রি (ফাল্গুন, ভারতবর্ষ)
সেমিরেসিস (বার্ষিক বাসন্তিকা)

১৩৩৩ লক্ষহীরা (আষাঢ়, ভারতবর্ষ)
অরূপরতন (কার্তিক, ভারতবর্ষ)
অজগরমনি (ফাল্গুন, কল্লোল)
কাজলরেখা (বার্ষিক, শিশুসাথী)
স্মৃতির ছায়া (বাসন্তিকা) [ভূত, ১৩৬৫:স্মৃতির ছাপ, ১৩৭৭]

১৩৩৪ বিদ্যুৎপর্ণা (আষাঢ়, ভারতবর্ষ)
চরকা (আশ্বিন, কল্লোল)
উইল (আশ্বিন, ভারতবর্ষ)
হারিকেন (কার্তিক, বিচিত্রা)
বহুরূপী (কার্তিক, ভারতবর্ষ)

১৩৩৫ ভারতী (বৈশাখ, ভারতবর্ষ)
প্রায়শ্চিত্ত (দেশবন্ধু স্মৃতি বার্ষিকী, আত্মশক্তি)
মা (ভাদ্র, ধূপছায়া)
সোনারকাঠির মোহন স্পর্শ (শারদীয়া বাংলার কথা)
উপাচার (শারদীয়া, আত্মশক্তি)
বিবাহ (কার্তিক, ভারতবর্ষ)
মাতৃমূর্তি (কার্তিক, কল্লোল)

১৩৩৬ সবিতা (আষাঢ়, বেনু)
১৩৩৭ স্বর্গমর্ত (পৌষ নাচঘর, বড়দিনসংখ্যা)
১৩৩৮ পঞ্চভূত (একাঙ্কিকা)

১৩৩৯ অপরাজিতা (আশ্বিন, পূর্বাশা)
টিয়া (কার্তিক, উত্তরা)

১৩৪০ আম্রমঞ্জরী (৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নবশক্তি)
ডিনামাইট (আষাঢ়, স্বদেশ)
বসুন্ধরা (মাঘ, পূর্বাশা)

১৩৪১ কবিপ্রিয়া (শারদীয়া, দীপালি)
ঘুমের ঘোরে (শারদীয়া, আনন্দবাজার)

মাধবীলতা (দোল সংখ্যা, আনন্দবাজার)

১৩৪২ সোমেশ সরকার [সাংঘাতিক লোক ১৩৭৪] (শারদীয়া দীপালি)
শেষ রাত্রি (শারদীয়া, নাগরিক)

১৩৪৩ কলংকীচাঁদ (শারদীয়া, অগ্রগতি)
বাঞ্ছা কল্পতরু (শারদীয়া, আনন্দবাজার)
তৃতীয় পক্ষ (শারদীয়া, স্বদেশ)

১৩৪৪ বিচার (আশ্বিন, পাঠশালা)
নাট্যকারের জীবননাট্য [সাংঘাতিক নাটক,যষ্টিমধু]
(শারদীয়া দীপালি)
কালার কান্ড (বার্ষিকী সোনারকাঠি)
মমতার মৃত্যু (বার্ষিকী, রূপশ্রী)
শ্রীমন্ত ও লক্ষীকান্ত (কার্তিক, পাঠশালা)

১৩৪৫ চতুরে চাতুরী (বৈশাখ, পাঠশালা)
চড়ুইপাখী (শারদীয়া, যুগান্তর)
Kiss Cure (শারদীয়া স্বদেশ)
ওয়াইল্ড ক্লাব (শারদীয়া, খেয়ালী)
কাজীর বিচার (শারদীয়া, রং মশাল)
উচিত শিক্ষা [যেমন কুকুর তেমন মুগুর, মাঘ মৌচাক ১৩৪৮]
(শারদীয়া যাদুঘর)
অমূল্য মূল্য (বার্ষিকী, মধুকরী)
উদ্ধার (শারদীয়া, শ্রীহর্ষ)
সোনার তাল (কার্তিক, পাঠশালি)

১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মন্মথ রায়ের পূর্ণাঙ্গ নাটকের তালিকা-

নাটক	রচনাকাল	প্রথম অভিনয়
বঙ্গে মুসলমান	১৯২০	বালুরঘাট ভ্যাকেশান ক্লাব প্রযোজিত এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব
চাঁদ সদাগর	১৯২৭	১৮/০৯/১৯২৭ মনোমোহন থিয়েটার
দেবাসুর	১৯২৮	২৮/০৪/১৯২৮ মনোমোহন থিয়েটার
শ্রীবৎস	১৯২৮	৮/৬/১৯২৯ স্টার থিয়েটার
মহুয়া	১৯২৯	৩১/১২/১৯৩০ মনোমোহন থিয়েটার
কারাগার	১৯৩০	২৪/১৩/১৯৩০ মনোমোহন থিয়েটার

সাবিত্রী	১৯৩১	১৯৩১শে মে মাস নাট্যনিকেতন
অশোক	১৯৩৩	২/১২/১৯৩৩ রঙমহল
খনা	১৯৩২	১১/৭/১৯৩৫ নাট্যনিকেতন
সতী	১৯৩৭	২৮/৪/১৯৩৭ নাট্যনিকেতন
রাজনটী	১৯৩৭	১৯৩৭ সি এপি ফার্স্ট এম্পায়ার
রূপকথা	১৯৩৮	১৯৩৮ সি.এ.পি. ফার্স্ট এম্পায়ার
মীরকাশিম	১৯৩৮	১৯৩৮ নাট্যানিকেতন

নাটক ও পালার রেকর্ড

খনা	১৯৩৪	মেগাফোন গ্রাম্যফোন কোম্পানী
রামপ্রসাদ	১৯৩৫	মেগাফোন
শকুন্তলা	১৯৩৫	মেগাফোন
লায়লা মজনু	১৯৩৫	এইচ. এম.ভি.
সিন্ধুবধ বা কালমৃগয়া	১৯৩৬	মেগাফোন

চিত্রকাহিনি বা চিত্রনাট্য

চাঁদসদাগর	১৭/০৩/১৯৩৪	ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
মহূয়া	০১/০৯/১৯৩৪	নিউথিয়েটার্স
শুভত্র্যহস্পর্শ	২৯/১২/১৯৩৪	ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স
অভিনয়	০৩/০৯/১৯৩৪	ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স
খনা	১২/১১/১৯৩৮	মেট্রোপলিটন পিকচার্স

মন্মথ রায় ১৯২৩ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বহু সংখক একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। জীবিকার প্রয়োজনে তিনি পূর্ণাঙ্গ নাটক, চিত্রনাট্য, যাত্রাপালা, রেকর্ডপালা, বেতার নাটক লিখেছেন ঠিকই কিন্তু সবচেয়ে কম অর্থ প্রদানকারী একাঙ্ক নাট্যরচনাই ছিল তাঁর সাহিত্য কর্মের প্রধান ফসল। বাংলা নাট্যক্ষেত্রে সাহিত্যরস সমৃদ্ধ নাট্যরচনাই তাঁর কাছে বরণীয় বলে মনে হয়েছিল।

নাটকের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মন্মথ রায় কোনো বাধা মানেননি। পৌরাণিক কাহিনি, কল্প কাহিনি, ঐতিহাসিক বিষয়, সমসাময়িক ঘটনা, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, যুগযন্ত্রণা, রোমান্টিকতা, মনস্তত্ত্ব, হৃদয়ের স্বধর্ম, সামাজিক চেতনা–সমস্ত কিছু নাটকে ছাড়িয়ে রয়েছে। একাঙ্ক এর ক্ষেত্রেও তাই। বিষয় বৈচিত্র্য এবং রচনার সংখ্যাধিক্যে তিনি আজও অপ্রতিদ্বন্দী। তিনি প্রায় ২৭৫টি একাঙ্ক রচনা করেছেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি একাঙ্ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

দেবদাসী (১৯২৩)ঃ

১৯২৩ সালের ৬ই নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বরের মধ্যে তিনি লিখলেন ‘দেবদাসী’। একটি অঙ্ক, একটি দৃশ্য। কবি কলহন প্রণীত ‘রাজতরঙ্গিনী’ অবলম্বনে কাশ্মীরের যুবরাজ জয়াপীড় এর সঙ্গে পৌন্ড্রবর্ধনের দেবদাসী কমলার প্রণয় রোমাঞ্চ ভিত্তিক একটি কাহিনি।

১৯২৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর জগন্নাথ হল ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন 'দেবদাসী' অভিনয় হয়।

সেমিরেসিস (১৩৩২)ঃ

বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'বাসন্তিকা'তে ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয় 'সেমিরেসিস'। নাটকটিতে রয়েছে একটি দৃশ্য, একটি অঙ্ক। ইতিহাসের আদি যুগে রানী সেমিরেসিস ভারত আক্রমণ করেছিলেন - এই এক অস্পষ্ট ঐতিহাসিক কাহিনিকে কল্পনার রং এ রাঙ্গিয়ে নাটককার নাটকটা লেখেন। 'সেমিরেসিস' পড়ে কাজী নজরুল ইসলাম পত্রদ্বারা জানিয়েছিলেন- ''শেমিরেসিস পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা বলে উঠতে পারছিনে। যতবার পড়ি ততবারই নতুন মনে হয়। আজ ইউরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হয়ে উঠতো। এ ঈর্ষার এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যেকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও। দু:খিত যতই হই''[১৬]।

রাজপুরী (১৩৩২) ঃ

রাজপুরী নাটকটি 'ভারত বর্ষ' পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় ১৩৩২ সালে প্রথম প্রকাশ। বৌদ্ধ কাহিনিকে মূল বিষয় হিসেবে নাটককার গ্রহণ করেছেন। নাটকে চরিত্র সংখ্যা আট। পুরুষ পাঁচ, নারী তিন।

কোশলরাজ আভিজাত্য রক্ষার জন্য তরোয়ালের জোরে বিবাহ করলেন বাসবক্ষত্রিয়াকে। বিবাহের ষোল বছর পর জানা গেল যে সে কপিলাবস্তুর এক নর্তকীর কন্যা। দীর্ঘ ষোল বছর মিথ্যা পরিচয়ে অর্জিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নারী বাসবক্ষত্রিয়ার জীবনে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। অন্তদ্বর্ন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রানী বার বার চেষ্টা করেছেন রাজপুরীর বাইরে আসতে। অবশেষে এই অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি কৌশলে রাজার কাছ থেকে নির্বাসন দন্ড ভিক্ষা করে রাজপুরী ত্যাগ করে। রাজপুরী পরিত্যাগের পর আত্মবিসর্জন করে রাজপুরীর মিথ্যা মর্যদায় আভিজাত্যের ওপর চরম আঘাত হেনে রাজার ক্রোধ থেকে শক্যদের রক্ষা করেছেন। কাহিনির মূল পটভূমি কোশলরাজও শাক্যবংশের বিরোধ হলেও নাট্যকাহিনিতে প্রাধান্য পেয়েছে নারীচরিত্র বাসবক্ষত্রিয়ার অন্তর্লোকের রহস্য উন্মোচন। নাটকটির কাহিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তীব্র গতিময়। নাটকে স্থান, কাল ও ক্রিয়াগত ঐক্য সঠিক মানা হয়েছে। নাটকটি দ্বন্দ্ব সংঘাতে মুখর। অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বর্হিদ্বন্দ্বের রানী বাসবক্ষত্রিয়া ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এই নাটকে মূল রস হল - করুণ রস যা রানীকে কেন্দ্র করে জাগ্রত হয়েছে।

বিদ্যুৎপর্ণা (১৩০৪)ঃ ভারতর্ষ পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত। চারটি দৃশ্য সমন্বিত একাঙ্ক। 'বিদ্যুৎপর্ণার' কাহিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ সংঘর্ষের পটভূমিকায় প্রেমের এক জটিল রূপায়ণ। হিন্দুধর্ম বিরোধী বৌদ্ধ রাজাকে হত্যা করার জন্য পুরোহিত অনাথা কন্যা বিদ্যুৎপর্ণাকে সাপের বিষ পান করিয়ে বড়ো করেছেন। এই কন্যার বিষ স্পর্শে মৃত্যু অবধারিত। একথা জানেন কেবল পুরোহিত। বিদ্যুৎপর্ণার রূপের আকর্ষণে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে। পুরোহিত শিষ্য ইন্দ্রজিৎ বিদ্যুৎপর্ণার প্রতি আকৃষ্ট একথা জানার পর ইন্দ্রজিৎকে

স্নেহ বশত বিদ্যুৎপর্ণার মোহ থেকে ফেরাতে গিয়ে পুরোহিত নিজেও বুঝতে পারে যে বিদ্যুৎপর্ণার প্রতি তার নিজেরও আকর্ষণ রয়েছে। ইতি মধ্যে রাজাও বিদ্যুৎপর্ণার স্পর্শে প্রাণ হারিয়েছে। বিদ্যুৎপর্ণা ইন্দ্রজিৎকে ভালোবাসে কিন্তু সে নিজে জানে না তার বিষাক্ত অস্তিত্বের কথা। পুরোহিত ইন্দ্রজিৎকে রক্ষা করার জন্য বিদ্যুৎপর্ণাকে চুম্বন করে প্রাণ বিসর্জন দেন। বিদ্যুৎপর্ণা তখন নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে সরসীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন করে।

নাটকটিতে প্রেম, কামনা, বাসনা, তীব্র দহনজ্বালা, রূদ্ধশ্বাসগতিতে ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এ নাটকে তীব্র উত্তেজনার পরিণতিতে রয়েছে ট্রাজিডি। পুরোহিতের ষড়যন্ত্র, বিদ্যুৎপর্ণার প্রতি তাঁর কামনাজনিত অন্তর্দাহ, ইন্দ্রজিৎকে রক্ষার জন্য পুরোহিতের আত্মিক দ্বন্দ্ব, বিদ্যুৎপর্ণার বিষাক্ত অস্তিত্বের কারণে সমগ্র নাটক জুরে গতিময় সংশয়ের দোলা নাটকটিকে সার্থক একাঙ্কের মর্যাদা দিয়েছে।

উপাচার (১৩৫৩)ঃ উপাচার নাটকটি 'আত্মশক্তি' শারদীয়া সংখ্যায় ১৩৫৩ তে প্রথম প্রকাশিত হয়। কামলোলুপ পশু শক্তির বর্বরতা, ধর্মের নামে ব্যভিচার, নারীর ত্যাগ এ নাটকের বিষয় বস্তু। সতী ভৈরবী তারা তার মুমূর্ষু স্বামী ভৈরব তারানাথকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গ্রামের প্রান্তে পঞ্চবটীর তলায় কল্যানের আশায়। গ্রামের জমিদারের ছেলের আরোগ্যের জন্য দুর্গাপুজোর আয়োজন করে। মহাষ্টমীর দিনে বীরঙ্গনাদ্বারের মৃত্তিকার প্রয়োজন হওয়াতে তারা ভৈরবীর আশ্রমে হাজির হয়ে কুৎসিত প্রস্তাব দেয়। পতিপ্রাণা তারা ফুঁসে ওঠে। সেও তো দেবীর কাছে এসেছ স্বামীর আরোগ্য কামনা নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতে হয়। ভৈরবী তার সতীত্ব ত্যাগ করেছে নি:স্বার্থ ভাবে। স্বাধ্বী শিরোমণি ভৈরবী তারা স্বামীর কল্যানের আশায় নারী জীবনের ঘৃন্যতম কলঙ্ক শেষ পর্যন্ত বরণ করে নিতে বাধ্য হয়।

ভৈরবীর এই নিষ্ঠা ও ত্যাগ পাঠকের মনে বিস্ময় বেদনা উদ্রেক করে। নাটককার সমদেবনার সঙ্গে ভৈরবীর মানসিক যন্ত্রণা, অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রামের অর্থবান বর্বরদের মুখোস নাটককার খুলে দিয়েছে নির্মম ভাবে। যদিও নাটকের শেষে দেখা যায় প্রকৃত বেশ্যাদারের মাটি পাওয়া গেছে। কিন্তু সামাজিক সমস্যা হিসেবে তা গুরুত্ব পায়নি; পেয়েছে পুজোর উপাচার হিসেবে।

ইলা (১৩৩৯)ঃ প্রথমে 'বাসন্তিকায়' প্রকাশ পায়। পরে স্বদেশ পত্রিকায় ১৩৩৯ এ শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৩৭২ সালে 'প্রিয়তম' নামেও প্রকাশিত হয়। বৃদ্ধ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এর অবৈধ সন্তান হরিচরণকে এতদিন সকলে আসল পুত্র জেনে এসেছে। হরিচরণ মদ্যপ চরিত্রহীন, ইলা তার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী। ইলার ওপর জগন্নাথের পালিতপুত্র প্রিয়তমের অধিক মনোযোগ ইলা বরদাস্ত করতে পারে না। এমন সময় শ্বশুরের কাছ থেকে জানতে পারে তার শ্বশুরের অবৈধ সন্তান হরিচরণের সঙ্গে বৈধ সন্তান প্রিয়তম এর বদল হয়েছিল। ঘটনাচক্রে প্রিয়তম নিজেকে হরিচরণ বলে পরিচয় দেয়। ইলার জীবনে নেমে আসে দুযোর্গ। মুমূর্ষু শ্বশুর ও কন্যা রাখীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। ইলা শ্বশুরের উইল এ দেখে সে সব সম্পত্তি ইলা ও প্রিয়তমকে দান করেছে। ইলার চোখ খুলে যায়। সে সংসারের মিথ্যা মাটির উপর আর দাঁড়াতে চায় না। পুলিশের কাছে গিয়ে 'সত্যহরিচরণের' কথা বলে-প্রিয়তমকে মুক্ত

করে আনে। এই একাঙ্কটি পাঠ করে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ছিলেন- ''ইলাও আমার বুকে কম দোলা দেয়নি।''[১৭]

পূর্ণাঙ্গ নাটকঃ

সাধারণ নাট্যশালার ঐতিহ্যের আদর্শকে সামনে রেখে মন্মথ রায় পূর্ণাঙ্গ নাট্য রচনা শুরু করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিকামনায় আন্দোলিত সে যুগটি উত্তাল উন্মাদনার যুগ। পরাধীন ভারত বর্ষের মুক্তি আন্দোলনে সাধারণ রঙ্গশালার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নাটককারের মনে হয়েছিল যে শুধু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম নয় অত্যাচার, নিপীড়ণ, শোষণ এবং দু:শাসনের বিরূদ্ধে সংগ্রাম হবে নাটক। তাই ''আমি প্রথমে ঐতিহাসিক নাটকের পথে না গিয়ে পৌরাণিক নাটকের আবরণে সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রকাশ করবার ব্রত গ্রহণ করলাম।''[১৮] তাঁর প্রথম দিকের বেশীর ভাগ নাটকই পৌরাণিক।

চাঁদসদাগর (১৯২৭)ঃ ১৯২৭ সালে আর্ট থিয়েটারের পরিচালক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কর্ণধার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি 'চাঁদসদাগর' নামে পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখেন। মনসামঙ্গলের পরিচিত কাহিনিকে তিনি নতুন ভাবে উপস্থাপন করেছেন। ''এতকাল আমাদের পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের আধিক্য এবং প্রাবল্য দেখা গেছে। সুরটা বদলাতে ইচ্ছা হল''[১৯]। চাঁদসদাগরকে তিনি বিদ্রোহী বাঙ্গালী রূপে উপস্থাপিত করলেন। নাটককারের দাদামশাই লোকসাহিত্য পন্ডিত রামপ্রসাদ গুপ্তের কাছ থেকে তিনি মনসাপুজোর রীতি নীতি সংগ্রহ করলেন। পৌরাণিক কাহিনি কাঠামোর মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেন আধুনিক মনন ও সংস্কার মুক্ত যুক্তিবাদ। মনসা ও চাঁদ সদাগররের বিরোধকে এ নাটকে প্রতিভাত করা হয় বৃহত্তম শক্তির দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে। বিদ্রোহী চাঁদ এর সংগ্রামী মনোভাব বহন করে আনে আধুনিক জীবন চেতনা। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ মনসা ও চাঁদসদাগরের বিরোধের মধ্যে আভাসিত হতে দেখে শাসক ও শোষিতের দ্বন্দ্বের ছবি। কিন্তু সব ছাপিয়ে নাটকে বড় হয়ে ওঠে পৌরাণিক দেবীচরিত্রের আধুনিক মানবীকরণ। মনসা হয়ে ওঠে নাটককারের অভিনব সৃষ্টি। ১৯২৭ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রথম রাতের অভিনয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হয়।

''নাটকখানি শুধু মনোমোহনেই নতুন নয়, নাট্যসাহিতেও নতুন। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্যমন্ডিত হয়েছে দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙলা দেশে অন্তত: একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কু-নাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।''[২০]

''কি ভাষার দিক দিয়া, কি চরিত্রাক্রমে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের বহু পরিচয় তিনি দিয়াছেন। বাঙলার প্রাণের বেদনা করুণা ও অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই 'চাঁদসদাগর', শতশত দর্শকে পরিতৃপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।''[২১]

দেবাসুর (১৯২৮)ঃ 'দেবাসুর' নাটকটিতে তিনি পৌরাণিক কাহিনির আবরণে সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। পরাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে যখন সরাসরি

রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা যেত না সেই সময়ে তিনি দেবতা-অসুর দ্বন্দ্বের প্রাচীন কাহিনির মোড়কে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান কামনা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রকাশের ইঙ্গিত। বৃত্রাসুরের স্বর্গরাজ্য অধিকার, শেষ পর্যন্ত দধীচির দেহের অস্থি দিয়ে তৈরি বজ্রে বৃত্রাসুরের মৃত্যু স্বর্গে দেবতার প্রতিষ্ঠা এ কাহিনিতে যেন দ্যোতিত হয়ে ওঠে সমকালীন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস।

নাটকের দেবভূমি যেন পরাধীন ভারতবর্ষ-দেবতারা স্বাধীনতাকামী দেশবাসী আর অসুরা পররাজ্যলোভী অত্যাচারী ইংরেজ। নাটকটি অভিনীত হওয়ার পর দর্শক মহলে একই সাথে সৃষ্টি হয় দেশকে ভালবাসার আবেগ ও অন্যায়ের বিরূদ্ধে প্রতিবাদী হবার সাহস। 'দেবাসুর' নাটকটিকে তিনি বৈদিক নাটক বলেছেন। রমেশ চন্দ্র দত্তের অনূদিত বেদের অনুসরণেই নাটকটি লেখা। নাটকটির গান লিখছিলেন নরেন্দ্র দেব ও অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরাধীন দেশের মানুষ এ নাটকে খুঁজে পায় এক গভীর বিশ্বাসের প্রার্থিত ভূমি-তা হল অত্যাচারের অবসান হবেই। নাটকটি ২৮শে এপ্রিল ১৯২৮ সালে মনোমোহন মঞ্চে অভিনীত হয়। 'দেবাসুর' অভিনয় হবার পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হল। ''পরাধীন ভারতের মর্মকথা মুক্তির আকাঙ্খা নাটকের মধ্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষভাবে আত্মত্যাগী দধীচির চরিত্র অতি মহান হইয়াছে।''[২২] কল্লোল এ লেখা হল ''নাটক প্লাবিত বঙ্গদেশে মাঝে মাঝে যে দুই-একখানি নাটক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কলারসিকের মনোহরণ করে 'দেবাসুর' তাহারই একখানি। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, সুললিত ভাষা গৌরব, অপূর্ব চরিত্রচিত্রণ নাটক খানিতে অপরূপ দান করিয়াছে।'' [২৩]

শ্রীবৎস (১৯২৯)ঃ শ্রীবৎস ও চিন্তার সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে পাঁচ অঙ্কের পৌরাণিক নাটক 'শ্রীবৎস'। শনি ও লক্ষ্মীর বিবাদকে কেন্দ্র করে শ্রীবৎস'র দুর্ভাগ্য ও জীবন সংগ্রাম ও নাটকে চিত্রিত হয়েছে। শণির কোপদৃষ্টির ফলে রাজা শ্রীবৎকে যে লাঞ্ছনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল সেই ঘটনাকে অত্যন্ত নিপূণ ভাবে গেঁথেছেন নাটককার। পৌরাণিক নাটকে ভক্তির রসের প্রাধান্য থাকায় অনেক সময় বিষয় বৈচিত্র্য কম থাকে। কিন্তু মন্মথ রায়ের হাতে পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনিতে খুব সহজ ভাবেই এসেছে সমকালীন জীবন চিন্তার ছাপ, ভক্তির সুর নয়, ভক্তির বদলে প্রাধান্য পেয়েছে নিয়তি। ১৯২৯ সালের ৮ই জুন স্টার থিয়েটারে 'শ্রীবৎস' প্রথম অভিনীত হয়।

মহুয়া (১৯২৯)ঃ নাটককার মনোমোহন থিয়েটারের পরিচালক প্রবোধ চন্দ্র গুহের অনুপ্রেণায় 'মহুয়া' নাটকটি লেখেন। 'মহুয়া' নাটকের মূল বিষয় হল বেদের মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদের একনিষ্ঠ প্রেম, বিবাহ ও প্রেমিকের জন্য প্রেমিকার স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ। নাটকটিতে উত্তর বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলন এবং হিলি ধর্মমহাসম্মিলনীর প্রভাব আছে। কারণ মন্মথ রায় ছিলেন সমাজসংস্কার আন্দোলন ও ধর্মমহাসম্মিলনীর অন্যতম উদ্যোক্তা এবং সংবাদ দাতা। হিলির ধর্মসম্মলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ তরুণ নাটককার বেদে কর্তৃক শৈশবে অপহৃত ব্রাহ্মণ কন্যা, মুসলমান বেদেনীতে পরিণত মহুয়াকে উদ্ধার করে শ্যামসুন্দরের ভক্তে পরিণত ও সুকৌশলে শুদ্ধি পূর্বক একনিষ্ঠ প্রেমিকায় উন্নীত করে সংস্কার মুক্ত প্রেমিক ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। এই নাটকের উদ্বোধন হয়েছে

শ্যামসুন্দর ও তাঁর মন্দিরের সামনে। মূল কাহিনিতে শ্যামসুন্দর ও মন্দিরের কোনো উল্লেখ নেই।

পূর্ববঙ্গের পল্লীকবি দ্বিজ কানাই এর লেখা 'মহুয়া' পালার আখ্যান ভাগটির মূল বিষয় জাতি ধর্ম সংস্কারের উর্দ্ধে মানুষী প্রেমের সংস্কার মুক্ত রূপের জয়গান। মন্মথ রায় উক্ত বিষয়টি উপজীব্য করে অতীত ঐতিহ্য, মানবতাবাদ, সংস্কার মুক্তি, জীবনের জয়গানকে সমন্বিত করে রচনা করেন 'মহুয়া'। এই নাটকে নাটককার বাংলার প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা ভবঘুরে মানুষ গুলির বিচিত্র জীবন যাত্রাকে চিত্রায়িত করেন। লোকগাঁথার মধ্যে যে বলিষ্ঠ জীবনধর্ম প্রকাশ পায় তাকে মূলধন করে নাটককারের রোমান্টিক কবিসত্তা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেছে। নাম-গোত্রহীন অন্ত্যজ, অবহেলিত বেদে সমাজের আশা আকাঙ্খা কামনা বাসনাকে নাটককার পরম মমতায় নাটকে প্রস্ফুটিত করেছেন। ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মহাসমারোহে মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। মহুয়ার গান গুলির রচনা করেন ও সুর দেন কবি নজরুল ইসলাম।

কারাগার(১৯৩০)ঃ মন্মথ রায়ের সবথেকে উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক পৌরাণিক নাটক হল 'কারাগার'। অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান ক'রে নাটককার মন্মথ রায়কে তাঁদের জন্য একটি নাটক লিখতে অনুরোধ করেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তখন জটিল। দেশজুড়ে চলছে আইন অমান্য আন্দোলন। দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল। '' এই পটভূমিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস কারাগার-এর কথা মনে এসেছিল। যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারই-সেই কারাগরেই আজও উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা সূর্য। ..... এই ভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার কারাগার নাটক''[২৪]।

'কারাগার' নাটকের বিষয় নেওয়া হয়েছে 'শ্রীমদ্ভাগবত' থেকে। ভোজবংশের রাজা উগ্র সেনের পুত্র কংসরাজার নিষ্ঠুর অত্যাচারে যাদবকূলকে নিপীড়ণ করতে লাগলেন। অত্যাচারিত যাদবদের প্রার্থনায় ভগবান কৃষ্ণ কারাগারে জন্ম গ্রহণ করলেন কংসকে ধ্বংস ক'রে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্যে।

'কারাগার' নাটকের পৌরাণিক কাহিনি কাঠামোর মধ্যে ধরেছেন সমকালীন সময়ের ছবি। 'কারাগার' কাহিনিতে বর্ণিত দুই প্রতিপক্ষ-অত্যাচারী রাজা কংস ও বসুদেবের নেতৃত্বে পরিচালিত যদুবংশের মানুষ গুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে সমকালীন ভারতবর্ষের অত্যাচারী শাসক ইংরেজ ও ভয়কাতর পরাধীন ভারতের প্রজাদের ছবি। নাটককারের বিশ্বাস কংসকে নিধন করার জন্য তারই কারাগারে ভূমিষ্ট হন কৃষ্ণ, তেমনই আগামীদিন পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে জন্ম নেবেন দেশের মুক্তিদাতা। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন মন্মথ রায়কে অভিভূত করে। পুরাণের কংসের কারাগার এ নাটকে রূপান্তরিত হয় ব্রিটিশ শাসিত ভারত কারাগারে। বাসুদেব সংগ্রামী মুক্তিকামী জনতার নায়ক কংকন ও কংকা সংগ্রামী যুবশক্তির প্রতীক। অগণিত সাধারণ মানুষ যেন পরাধীন ভারতবাসী।

১৯৩০ সালে ২৪শে ডিসেম্বর মনোমোহন থিয়েটার 'কারাগার' মঞ্চস্থ হয়। পরিচালক

ছিলেন সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ (দানীবাবু)। 'কারাগারে'র গান রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং হেমেন্দ্র কুমার রায়। 'কারাগার' অভিনয়ের পর চারিদিকে কলরব সৃষ্টি হল, মানুষ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'কারাগার' সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার আলোচনা উল্লেখযোগ্য- ''নাটকখানি পৌরাণিক হইলেও বর্তমান আবহাওয়ার সহিত বেশ খাপ খাওয়ানো হইয়াছে।''[২৫]

''কাহিনি পুরাতন হলেও শক্তিশালী নাট্যকারের হাতে পড়ে সে আখ্যায়িকা যেন সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ দেশকাল পাত্রের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, কারাগারের যে ছবিটি মন্মথ বাবু এঁকেছেন তা বিশ্বজনীন হয়ে দেখা দিয়েছে।''[২৬]

'কারাগার' যেমন পৌরাণিক তেমনি রূপক নাটকও বটে। রূপকের মোড়ক সরিয়ে দিলে স্পষ্টই বোঝা যায় কংসের কারাগার নয়-অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কারাগর। সেই কারণে ১৯৩১, ১লা ফেব্রুয়ারী নাটকটির অষ্টাদশ অভিনয়ের পর বৃটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে অভিনয় বন্ধ করে দেয়।

'কারাগারে'র অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার পর সংবাদ পত্র গুলি সোচ্চার হয়েওঠে।

The Bengali পত্রিকা লিখলো BAN ON KARAGAR শিরোনাম দিয়ে ''....the ground for the prohibition is that the play is likely to excite feelings of disaffection towards Government established by law in British India''[২৭]

''..... এই হতভাগ্য পরশাসিত দেশে সবই সম্ভবপর। 'কারাগার' একখানি পৌরাণিক নাটক। দ্বাপরের অত্যাচারী মথুরার রাজা কংসের কাহিনি অবলম্বন করিয়া লিখিত। বাঙ্গালার গর্ভনমেন্টের কর্তারা ইহার অভিনয়ে এমন কি আপত্তির কারণ দেখিতে পাইলেন? অথবা দ্বাপর যুগের 'কারাগারের' সঙ্গে এই কলিযুগের 'কারাগারের সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি তাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।''[২৮]

সাবিত্রী (১৯৩১)ঃ নাট্যনিকেতনের অধিকারী শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র গুহের অনুরোধে মন্মথ রায় 'সাবিত্রী' নাটকটি লেখেন। সাবিত্রীর মত সর্বজনজ্ঞাত এবং বহু আলোচিত পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বন করে নাটককার 'সাবিত্রী' নাটকটি রচনা করেছেন। কাহিনির মধ্যে নাটকত্ব খুব কম, নাটকত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি অভিনব রূপে চরিত্র সমাবেশ করেছেন।

বিধিলিপি অগ্রাহ্য করে যমের কাছ থেকে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছে সাবিত্রী। ভারতীয় নারীর সতীত্বের কাহিনির মর্মগত সত্য অক্ষুন্ন রেখে তিনি আধুনিক চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করে দিয়েছেন সাবিত্রীর মধ্যে। সাবিত্রী চরিত্রে যমের সঙ্গে সংগ্রামের যে ছবি তা আধুনিক সমাজের নারীচরিত্রের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধেরই পরিচায়ক। নাটকের প্রধান চরিত্র অশ্বপতি। অশ্বপতির সন্তান বাৎসল্য, পিতৃহৃদয়ের উদ্বেগ, তার মানসিক সন্তাপ এই নাটকের সম্পদ। অশ্বপতি চরিত্র পরিচালনায় নাটককারের আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটেছে। নাটকটিতে পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে নাটককারের সমাজ চেতনার প্রকাশ ঘটেছেয ১৯৩১ সালে

মে মাসে 'সাবিত্রী' নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির গান রচনা ও সুর সংযোজন করে কাজী নজরুল ইসলাম।

খনা (১৯৩৫)ঃ 'খনা' নাটকটি মন্মথ রায় পুরাণ, প্রবাদ, হিতোপদেশ, রূপকথা মিলিত করে 'খনা' রচনা করেছেন। পূর্ববর্তী নাটক গুলি কারো না কারো প্রেরণায় লিখেছেন কিন্তু 'খনা' নাটকটি নিজের প্রেরণায় লিখেছেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জোতিষার্ণব বরাহ। তাঁর পুত্র মিহিরের জন্মের পর তিনি পুত্রের ভুল আয়ু গণনার ফলে শতায়ু পুত্রকে দশ বছরের পরমায়ু মনে করে তাকে একটি তাম্রপত্রে নদীতে ভাসিয়ে দেন। ভাসতে ভাসতে শিশু মিহির সিংহলে পৌঁছায়। সিংহল রাজার পালিত পুত্র রূপে সে বড় হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম বিদূষী সিংহল রাজকন্যা খনার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। খনার গণনায় মিহির তার পিতৃপরিচয় লাভ করে। দুজনেই ভারতবর্ষে ফিরে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় এসে জ্যোতিষ বিচারে বরাহকে পরাস্ত করেন। বিক্রমাদিত্য খনার স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করে তাঁর নবরত্ন সভায় বরাহের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। মিহির পিতার অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে খনাকে ভর্ৎসনা করেন। খনা বরাহের অপমান ও স্বামী মিহিরের ভর্ৎসনা সহ্য করতে না পেরে নিজের জিহ্বা কেটে প্রাণ বিসর্জন করেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নাটককার খনার কাহিনিকে রূপদান করেন। বিশ শতকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রময়ী একটি উজ্জ্বল চরিত্ররূপে তাকে চিত্রিত করে তুলেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে ব্যক্তিসত্তা যেখানে লাঞ্ছনায় বঞ্চনার অপমানে পদদলিত হয় সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরূদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় খনার আত্মহণনের মধ্য দিয়ে। 'খনা' নাটকটি নাট্যনিকেতনে ১৯৩৫ সালে ১১ই জুলাই প্রথম অভিনীত হয়। 'খনা' নাটকের সঙ্গীত রচনা করেছেন অখিল নিয়োগী। সুর দিয়েছেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

সতী(১৯৩৭)ঃ ক্যালকাটা থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মন্মথ রায় ১৯৩৭ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১০ই এপ্রিল- এই কয়দিনে 'সতী' নাটকটি রচনা করেন। 'সতী' পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক। নাটকটি দক্ষের কন্যা, শিবের পত্নী সতীকে নিয়ে প্রাচীন কাহিনির একটি উজ্জ্বল নাট্যরূপ। পুরাণের কাহিনি অবলম্বনে সতী মাহাত্মের এ নাটক সে যুগে দর্শকের বেশ মনোরঞ্জন করেছিল। এই নাটকে সঙ্গীত রচনা ও সুর আরোপ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

অশোক (১৯৩৩)ঃ 'অশোক' নাটকটি ইতিহাস নিয়ে নাটকলেখার প্রথম প্রচেষ্টা। চন্ডাশোকের ধীরে ধীরে ধর্মাশোকের পরিবর্তিত হবার ঐতিহাসিক কাহিনি এই নাটকের বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে নাটকটি স্বার্থক। এ নাটকে বীরত্বব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টি ঘটনার ঘনঘটা, তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে ওঠা, চরিত্র ও তাদের শক্তিদীপ্ত রূপ সবই আছে। ধর্ম প্রকৃতি আর চন্ডপ্রবৃত্তির মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লান্ত পৃথিবীর অন্যতম সম্রাট অশোকের জীবন এ নাটকে চমৎকার ভাবে বিধৃত হয়েছে। পরিশেষে সম্রাট আশোকের মগ্ন চৈতন্যের আত্ম বিকাশ অপূর্ব এক রসের সৃষ্টি হয়েছে।

'অশোক' ১৯৩৩ সালে ২রা ডিসেম্বর 'রঙমহলে' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। 'অশোক' এর গান রচনা করেছিলেন অখিল নিয়োগী। সুরকার ছিলেন নিতাই মতিলাল।

মীরকাশিম (১৯৩৮)ঃ ১৯৩৮ সালের ১৮ই নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত- এই সময়ের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার লক্ষ্য নিয়ে তিনি 'মীরকাশিম' রচনা করেন। 'মীরকাশিম' সংক্রান্ত নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যায়ন করেই তিনি 'মীরকাশিম' রচনা করেছিলেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকের দুরভিসন্ধির ও চতুরতায় ভারতবর্ষের যে ভাগ্য রচিত হয়েছিল শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিম এর হৃদয়ে তা কতটা দ্বন্দ্বের ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল সেই বিষয়টি নাটকটিতে তুলে ধরা হয়েছে। নাটককার স্বয়ং জানিয়েছেন- ''আমার অন্য দেশাত্মবোধক নাটক 'মীরকাশিম' সেন্সারের ছুরিতে ক্ষত- বিক্ষত হলেও, নটসম্রাট ছবি বিশ্বাসের সুঅভিনয়ে জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়নি নাট্যনিকেতন মঞ্চে, ১৯৩৮ সালে''[২৯]।

যদিও নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ঘটনা ইতিহাস অনুমোদিত তবুও নাটককারের অতি মাত্রায় ইতিহাস প্রবণতার কারণে চরিত্রের অন্তর্জগতের মানসিক আবেগ অনুভুতি প্রকাশে সামান্য বাধার সৃষ্টি হয়েছে। নাটকটি হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব পূর্ণভূমিকা পালন করেছে। ১৯৩৮ সালে নাট্যনিকেতনে 'মীরকাশিম' প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

মন্মথ রায়: সম্মান ও স্বীকৃতি-

১। বিশ্বরূপা স্বর্ণপদক-১৯৬৪
২। আন্তর্জাতিক সোভিয়েত ল্যান্ড সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার-১৯৬৭
৩। সাহিত্য বাসর উল্টোরথ শ্রেষ্ঠ্য নাট্য পুরস্কার-১৯৬৭
৪।ম্যস্কিম গোর্কির আন্তর্জাতিক জন্ম শতবর্ষে গোর্কি মহানগরীতে প্রতিনিধি হয়ে যোগদান-১৯৬৮।
৫। ন্যাশনাল সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি নাট্য পুরস্কার-১৯৬৯
৬। পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নাটক চারুকলা অ্যাকাডেমি নাট্য পুরস্কার-১৯৭১
৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সুধাংশু বালা পুরস্কার-১৯৭২
৮। বালুরঘাট শহরের পুরসভা কর্ত্তৃক নাটককারের বাড়ির সামনের রাস্তার নামকরণ মন্মথ রায় রোড-১৯৭৩
৯। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিকী স্মারক স্টার থিয়েটার স্বর্ণপদক-১৯৭৯
১০। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি.লিট উপাধী-১৯৭৯
১১। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক-ডি.লিট উপাধী-১৯৮১
১২। বিশ্ব শান্তি সংসদ কর্ত্তৃক বিশেষ পদক দ্বারা অভিনন্দিত-১৯৮১
১৩।পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক জাতীয় সম্বর্ধনা-১৯৮১
১৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক সম্বর্ধনা-১৯৮২
১৫। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রেষ্ঠ নাট্য সম্মান দীনবন্ধু পুরস্কার-১৯৮৪
১৬। দিশারী ইন্দিরাগান্ধী স্মৃতি পুরস্কার-১৯৮৭।

১। সত্যরঞ্জন তালুকদার (১৯৩৫ - ২০০৮)

একই অঙ্গে বহুরূপের প্রকাশ দেখা যায় অতি অল্প সংখক লোকের মধ্যে। সত্যরঞ্জন তালুকদার ছিলেন সেই বিরল সংখ্যক লোকের একজন। District Sports এ খেলার মাঠকে রসালো ধারাভাষ্যে মাতিয়ে রাখার ক্ষমতা এই অঞ্চলে একমাত্র তাঁরই ছিল। তিনি ছিলেন জাত শিক্ষক, প্রতিভাবান নট ও নাটককার, বৈঠকী গল্পের অনুকরণীয় হাস্যরসের ভান্ডারী। কচিকলা একাডেমী, বালুরঘাট নাট্যমন্দির, নিজস্ব সংস্থা ত্রিশুল এবং ত্রিতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়ে সব মঞ্চেই অভিনয় করেছেন। পরিচালক হিসেবেও তিনি পরিচিত।

অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নাটোরের কাছে পাকশা গ্রামে ১৯৩৫ সালের ১৫ই নভেম্বর জন্ম। পিতা জীতেন্দ্র নাথ তালুকদার, মাতা পরিমলবাসিনী দেবী। পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন নিয়ে বিশাল একান্নবর্তী পরিবার ছিল তাঁদের, শৈশবেই পাকশা গ্রামে দুর্গাপূজার সময় নিজের উদ্যোগে বাচ্চাদের দিয়ে নাটক করাতেন। ছিন্নমুল উদ্বাস্তু হিসেবে নাটোর থেকে ১৯৪৮ সালে ভারতে আসেন। পূর্ববাংলায় অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের হলেও এখানে এসে তাঁকে দুরবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। এক সময় যৌথ পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনে বুড়িমা কালী সরণীতে পারিবারিক ছাতা মেরামতির দোকানেও বসতেন। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে, পতিরাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষকতা করেন। দারিদ্রের কারণেই তাঁকে পড়াশুনাবাদ দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী নিতে হয়েছিল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের দোপিঠা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী নিলেন। তিনি তখন থাকতেন কুশমন্ডিতে। এই সময়ে তিনি একটি নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। এখানে নিয়মিত নাটক অভিনয় হত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী করতে করতে তিনি প্রাইভেটে অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। এরপর তিনি নদীপার এন.সি. হাইস্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সকলের প্রিয় মাষ্টারমশাই ছিলেন সত্যরঞ্জন তালুকদার। এ অঞ্চলে সত্যরঞ্জন তালুকদার (গোবিন্দ মাষ্টার) মিথের মত ছিলেন। উন্নত মূল্যবোধ, সহজাত রসবোধে সিক্ত, আলাপচারিতায় সিদ্ধ, মিশুকে প্রাণবন্ত বড় মন ও বড় মাপের মানুষ ছিলেন গোবিন্দ তালুকদার। তিনি সদানন্দময় থাকতেন। অবসাদের ছায়া কখনো তাঁকে গ্রাস করেনি। হাসিই ছিল তার জীবনবেদ। তাঁর হাস্যরসে ছিল Humar কিন্তু কখনও তা Wit এ সমুজ্জল হয়ে উঠত।

বিভিন্ন প্রতিভার আধার গোবিন্দ তালুকদারের অভিনয় নৈপুণ্য ছিল অসীম। নাট্যমন্দিরে 'মহিলা চরিত্র' হিসেবে তিনি ছিলেন উচ্চ প্রশংসিত। ''গবাদা তখন নাট্যমন্দিরে 'মহিলা চরিত্র' শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত প্রশংসিত অভিনেতা''[৩০]। নারীচরিত্রে, পুরুষ চরিত্রে বিশেষ করে সিরিও কমিক অভিনয়ে তিনি একসময় বিভিন্ন মঞ্চে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। ত্রিতীর্থের অন্যতম প্রতিষ্ঠা সদস্য ১৯৬৯ -১৯৮০ সাল পর্যন্ত অন্যতম প্রধান অভিনেতা। ''ভাগ্যচক্রে আমার পরিচালনায় একজন নির্ভর যোগ্য সক্ষম অভিনেতা। শুধু তাই নয় গবাদার Serious নাট্য রচনা ও এই সময় পারদর্শীতার শীর্ষ বিন্দু ছুতে পেরেছিল। 'ভাঙ্গাপট'কে ভেঙ্গেচুরে 'বাহে Dialect' এ পুনর্লিখন করে গবাদা বিস্মিত করে আমাকে, সবাইকে। বলতে দ্বিধা নেই নীহারদা মূল অনুবাদক হলেও ভাঙ্গাপটের মূল সাফল্যের কৃতিত্ব গবাদার''[৩১]।

'ত্রিশূল' নাট্যসংস্থার তিনশূলের মধ্যে একজন প্রধান শূল হলেন গোবিন্দ তালুকদার। অবিনাশ দত্ত, কানাই দত্ত ও গোবিন্দ তালুকদারকে ত্রিশূলের তিনটি শূল বলা হত। নাট্যমন্দির, ত্রিশূল, ত্রিতীর্থ, নাট্যসংস্থায় অভিনয় করেছেন। ত্রিতীর্থে 'দেবীগর্জন', 'গ্যালিলেও', 'অমৃতস্য পুত্রা:' প্রভৃতি নাটকে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দর্শককুলকে আকৃষ্ট করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সত্যরঞ্জন তালুকদারকে 'গবাদা' বলে ডাকতেন। ''গবাদার 'মাষ্টের' ভাঙ্গাপটের এক অনতিক্রম্য অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর। আমি বাধ্য হয়ে গবাদার অনুপস্থিতিতে এই চরিত্রে অভিনয় করেছি, কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই- I Could not excel his wonderfull acting. অভিনেতা হিসেবে গবাদা মূলত আমার বিবেচনায় Serio Comic ভূমিকায় অধিক অনায়াস স্বচ্ছন্দ ছিলেন। Serious চরিত্রেও তাঁর অপূর্ব অভিনয়ের স্বাক্ষর 'দেবীগর্জন', গ্যালিলিও, অমৃতস্যপুত্রা:।''[৩২]

১৯৭৯-১৯৮০ সাল নাগাদ তিনি 'ত্রিতীর্থ' নাট্যসংস্থা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। কিন্তু সংস্কৃতি থেকে তিনি কখনো নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেননি। নাট্যমন্দিরে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছেন 'লক্ষ্মীবাঈ', 'কেদারের স্ত্রী'। তাঁর পরিচালিত নাটক ত্রিশুল নাট্য সংস্থায় 'মুক্তধারা', 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও 'রাক্ষশ'।

সত্যরঞ্জন তালুকদারের নাট্য প্রতিভা বালুরঘাটের অন্যান্য নাটককারদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর নাটকগুলি স্বল্প দৈর্ঘ্যের। তাই একই মঞ্চে একই সঙ্গে দর্শককুল দেখতে পান ভিন্ন স্বাদের নাটক। যদিও অতি অল্প পরিসরের মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে তাঁর বিষয় ভাবনার নানা দিক উঠে আসে। তাঁর প্রগাঢ় সমাজদৃষ্টি, রসিক মন তুলে ধরে কখনো মানুষের সংকট কখনো হালকাচালে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক। তিনি মোট ১৭টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটকগুলি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-মৌলিক ও নাট্যরূপ। তিনি নাটক গুলির কখনো নামকরণ করেছেন কখনো নামকরণ করেননি। তাঁর নিজের হাতের লেখা কয়েকটি নাটকের পাণ্ডুলিপি দেখেছি সেগুলিতে কোনো সময়ের উল্লেখ নেই। তাঁর সমস্ত নাটক অভিনয় হয়েছে এবং প্রতিটি নাটক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দ্যেশে রচিত।

মৌলিক নাটক:

১। কেতোর গল্প,
২। শব্দ দূষণ
৩। নিরক্ষরতা দূরীকরণ
৪। কাঁচের Accident
৫। কলার খোসায় পিছলে পড়া
৬। বৃক্ষরোপন,
৭। একসঙ্গে তিনটি নাটক-
(ক) বার হাত কাঁকড়ের তেরো হাত বিচি
(খ) এখনও দাগ
(গ) আড্ডা

৮। নামকরণহীন
৯। নতুন আলো (বেতার নাটক)
১০। মরুপথে
১১। পরিবর্তন
১২। বীরবরোপাখ্যান (অমিত্রাক্ষর ছন্দ)

নাট্যরূপ

শিশু-(রবীন্দ্রনাথের কবিতার নাট্যরূপ)
১৩। বিচিত্র সাধ - (রবীন্দ্রনাথের কবিতার নাট্যরূপ)
১৪। কাবুলিওয়ালা - (রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ)
১৫। ছাত্রধারা-
১৬। সেলফিস জায়েন্ট
১৭। প্রেমপরীক্ষা (বিশপস ক্যান্ডেল স্টিকস অবলম্বনে)

কেতোর গল্প ঃ 'কেতোর গল্প' নাটকটি মূলত নিরক্ষতার দূরীকরণের উপর ভিত্তি করে রচিত। এখানে দেখা যায় কৃষকদের দু:খ দুর্দশা ধার কর্জের মধ্য দিয়ে তাদের চাষবাস করতে হয়। নিরক্ষর মানুষগুলিকে ঠকিয়ে স্বার্থান্বেষী মানুষগুলি নিজের পেট পূরণের দৃশ্য। ধোপা দম্পাত্তি 'গাধা'র মত একটি পশুকে কিভাবে মাতৃ-পিতৃস্নেহে লালন পালন করেছে। নাটকের শেষে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাগ্রহণই একমাত্র পথ। স্বার্থপর দুর্বৃত্ত লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় চলতে হলে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তারা সকলেই শিক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত হয়েছে।

প্রকৃতি:- একটি দৃশ্যে সমাপ্ত।

চরিত্র:- সাত জন চরিত্র ও গ্রামবাসী।

ভাষা:-নাটকটিতে দুই রকমের বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। V.L. সাহেব চলতি বাংলা (Standerd Language) কথা বলেছেন। বাকি সমস্ত চরিত্র দক্ষিণ দিনাজপুরের স্থানীয় ভাষায় কথা বলেছেন।

সংলাপ:-

বয়স্ক: হামার তো বাপু তিন কাল যায়ে এককাল-বুড়া হাড়ে আর নেকাপড়া।

V.L: লেখা পড়ার কোন বয়সই নেই। দেখুন কিছু শিখলেই নিজেরা কাগজ পড়ে, বই পড়ে কৃষি কাজটাও তো ভাল করে করতে পারেন। কোন বীজ কেমন ফলন দেয় - কোন্ সময় কোন্ সার কতটুকু লাগবে। কোন্ ওষুধ ফসলের কোন ব্যরামে কতটা ব্যবহার করবেন-সবইতে নিজেরা জেনে করতে পারেন। সবচাইতে বড় কথা দেশের লোক হিসেবে আপনাদের অধিকার কতটুকু সেটা নিজেরা জানতে পারেন।

সেই লোক: সিলার তনকে তো তোঁরাই আছেন বাবু।

V.L: আমরাও তো ঠকাতে পারি বা আপনার দরকারের সময় আমাকে পেলেন না।

সেই লোক: ও হ্যাঁ তাই তো ভুলেই গেছুনু। এটা কথা কচ্ছি। হামাকে যে সিদিন কনেন হামার ছৈলটাকে কি যেন ইঞ্জিসন দিবা নাগবে তা ক'টে যাবা নাগবে?

V.L: সে কি এখনও হয়নি-বাচ্চাটার শরীর তো খারাপ হয়ে যাবে। Hospital এ ঐ Injection বিনি পয়সায় দেবে।
সেই লোক: হয় বাবু ..... হাঁরা গেলে পাত্তাই দিবা চায় না .....

শব্দদূষণ: খুব সীমিত পরিসরে নাটককার দেখিয়েছেন শব্দ দূষণের কুফল। একদল যুবক যে পড়াশোনায়, খেলাধুলায়, তাই সমস্ত বিষয়ে মনোযোগী এবং ভালো; সেই রকম একটি প্রতিভা কেমন করে শব্দ যন্ত্রনা যার ফলে পাগলে পরিণত হয়েছে। এতো একটি ছেলে নয় লক্ষ লক্ষ মানুষকে অসুস্থ করে তুলছে আর অসুস্থ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঢেলে দিচ্ছে।

প্রকৃতি- এক দৃশ্যে নাটকটি সমাপ্ত।
চরিত্র- চার টি
ভাষা-চলতি বাংলা ভাষা

সংলাপ-

ভদ্রলোক- আমি কলেজে পড়ি। তবে ব্যপারটা জেনেছি একটা প্রবন্ধ পড়ে। অতিরিক্ত শব্দ কারও কারও মাথা খারাপ করে দেয়।
পাগল- আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমন পশিল.....
দ্বিতীয়- দাদা চুপ কর। আচ্ছা এর কোন চিকিৎসা.....
ভদ্রলোক- হ্যাঁ তাও পড়েছি। মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিতে হবে। আর ওকে বেশ কিছুদিন কোন সুন্দর গ্রামের নিশ্চুপ পরিবেশে রাখতে হবে।
দ্বিতীয় - বেশী শব্দ আমাদের এরকম ক্ষতি করে?
ভদ্রলোক- নিশ্চয়ই। বিরক্তির মধ্য দিয়েই মানুষের মস্তিকের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। দেখ না হাসপাতালের সামনে গাড়ীর হর্ন বাজনো নিষেধ করা হয়।

নাটককার সত্যরঞ্জন তালুকদার কখনো কখনো মজাদার ভাবে নাটক উপস্থাপন করেছেন। একটি নাটকে দেখা যায় একটি T.V. চ্যানেলের মাধ্যমে একই সঙ্গে তিনটি ভিন্ন স্বাদের নাটক পরিবেশিত হয়েছে। দর্শক একই আসনে বসে তিনটি নাটক দেখবেন। যদিও নাটকগুলি অতিস্বল্প পরিসরের। মঞ্চে দেখা যাবে কাল্পনিক T.V. রয়েছে, রয়েছে ঘোষক। T.V. তে বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের নাম ও সময় ঘোষণা করা হয়েছে। T.V. এর প্রথম অনুষ্ঠান। **''বারো হাত কাঁকরের তেরো হাত বিচি''**।

''বারো হাত কাঁকরের তেরো হাত বিচি'' নাট্যংশে দেখানো হয়েছে দুই বন্ধুর শারীরিক চেহারার সঙ্গে তাদের নামের বৈসাদৃশ্য। তাদের শারিরীক গঠনের জন্য তাদের বৈবাহিক জীবনের অশান্তি। একবন্ধু অতীব লম্বা কিন্তু তার নাম দুর্বাদল। অপর জন খুব বেঁটে কিন্তু তার নাম গগন। আবার দেখা যায় লম্বা ভদ্রলোকের স্ত্রী বেঁটে। আর বেঁটে ভদ্রলোকের বৌ তার থেকে এক ফুট লম্বা। স্বাবাবিক ভাবেই দেখা যায় দুই বন্ধুই স্ত্রীর সঙ্গে বাড়ির বাইরে বের হতে লজ্জা পায়। উক্তি -প্রত্যুক্তি, ছড়া কাটার মধ্য দিয়ে চলিত ভাষায় দুই বন্ধুর মনের কষ্ট সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

১ম- কি রে বাঁটু। এদিকে কোথা যাচ্ছিস্।

২য়- আর-যাচ্ছি! জীবনটা ঝালা পালা হয়ে গেল ভাই।

১ম- সে কি রে! তোর নাম গগন। চন্দ্র, সূর্য-তারাদের নিয়ে তোর কারবার। সবকিছু নিয়মিত চলছে, তাতে ঝালা পালার কি হ'ল? আর তুই এই বাটকুল তোর নাম কে রাখল 'গগন'?

২য়- আর তোর নাম? তুই লম্বু, তোরনাম কি না 'দূর্বাদল'।

১ম- ঐখানেই তো আমার মনোকষ্ট ভাই। আমি লম্বু, আর আমার বউ কিনা বেঁটে।

২য়- আর আমার? আমার বউ আমার থেকে একফুট লম্বা। লজ্জায় আমি বউ নিয়ে কোথাও যাই না, জানিস্।

১ম- আমারও তাই রে!

এখনো দাগঃ T.V. চ্যানেলের বিনোদনের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান আমাদের মনে করে দেয় দেশভাগের যন্ত্রণা। সাধারণ মানুষ ভারতের স্বাধীনতা পর্বে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল- ভারতবাসী ও পাকিস্থানী। কোটি কোটি মানুষ পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অজানা স্বর্গে পৌঁছানোর জন্য ওপার থেকে এপার (ভারত) এপার থেকে ওপার (পাকিস্থান) বহু কষ্ঠ সহ্য করে তারা আবার প্রায় স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু এর পরও মানুষের জীবন থেকে যুদ্ধ, অশান্তি, দাঙ্গা ছেড়ে গেলনা। যদিও নাট্যাংশটিতে স্বাধীনতা পরবর্তী কালের পাকিস্থানের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান) যুদ্ধের পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে।

নাট্যাংশটিতে দেখানো হয়েছে মোহন ও মদন ছোটবেলার বন্ধু ১৯৫০ সালে সান্তাহারের যুদ্ধের সময় মোহন তথাকথিত পাকিস্থান ত্যাগ করে ভারতে আসে, মোহন পূর্বপাকিস্থানের নওগাঁ থেকে চাকদা এসে একটা ব্যবসা ধরেছেন। দেশত্যাগের দু:খ নিয়েও ও তিনি ভালো আছেন। কিন্তু মদন যিনি পূর্বপাকিস্থানের নওগাঁতে উকিল ছিলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিল মদনের এবং ওকালতিতে পসরাও ভালো হতো কিন্তু ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় তিনি নওগাঁ ত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র সমেত ক্যাম্পে থাকেন। সেখানে নিজের ছেলেদের অপ্রিয় ব্যবহারে ক্যাম্প ত্যাগ করেন। তিনি পরিবার ছাড়া হন। পরবর্তীতে পশ্চিম দিনাজপুরের কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী পেলেও তিনি তা করতে পারেননি। লক্ষহীন ভবিষ্যতের পথে বেড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে কোনো কারণে তাঁর কারাবাস হয়। তারপর তিনি ঘুরতে ঘুরতে বৃন্দাবনে যান এবং সেখানে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন। একজন উকিল তাকে কিনা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়-এর থেকে বড় ট্রাজিডি আর কী হতে পারে- মানুষের জীবনে। দুই বন্ধুতে দেখা হয়েছে বৃন্দাবনের যমুনা তীরে বহু দিন পরে দুই বন্ধু নিজেদের ছেলের কথা পূর্ব জীবনের কথা বলেছে। নিজেদের অজানাতেই তাঁরা চলে গেছেন পরম সুখরাজ্যে। পূর্ববঙ্গের (নওগাঁ) ভাষায় কথা ব'লে দুই বন্ধু নিজের মনকে প্রকাশ করছে।

সংলাপঃ

মোহন- আমি বিন্দাবনে বেড়াতে আস্যা যমুনার ধারে বস্যা ছিলাম, ওটি গেলুই বা ক্যা, পালালুই বা ক্যা।

মদন- ভিকসা দিজিযে বল্যা হাত পাততেই, আপনি দেখ্যা আমাকে চিন্তে পাইরলেন-তাই..... (কান্না)

মোহন- আপনি কে? আমরা দুই বন্ধু ছিলাম না? ইস্কুলে আমাদের দেখলে সকলে মদন মোহন কর্‌্যা ডাকতো না?

মদন- ওগল্যা সব ভুল্যা গিছি।

মোহন- ভুল্যা যাওয়া কি সহজ কথা? আমি তো ভুলিনি। আমার সঙ্গে আগের মতই কথা ক! ক!

মদন- কি কব। কওয়ার কি আছে। আমি এখন ভিক্ষ্যা কর্‌্যা বিন্দাবনের রাস্তায় ঘুর্‌্যা বেড়াই। কত মানুষ খেদায়া দেয়। কতজন কিছু দেয়। আপনি.....।

আড্ডাঃ T.V. চ্যানেলের তৃতীয় অনুষ্ঠান 'আড্ডা'। আড্ডা বাঙ্গালী জীবনের একটা অঙ্গ। অনেকে বলেন বাঙ্গালীদের নাকি আড্ডা না দিলে খাবার হজম হয় না। আড্ডাতে বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে-রাজনীতি, সাহিত্য, খেলাধুলা, নাটক সবই আড্ডার বিষয় হতে পারে। আবার কখনো কখনো কেবল সময় কাটানোর জন্যও আড্ডায় বসে অনেকে। নাট্যাংশে দেখা যায় কিছু বেকার যুবক এবং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল একব্যাক্তির (মাধবদা) আড্ডা। গল্পে দেখা যায় রাজনীতির কথা তাদের আর ভালো লাগছে না। তারা অন্য কোনো হাস্যকর বিষয়ের অবতারণা করেছে। সেদিন তাদের আড্ডার বিষয় হয়েছে রাতে দেখা স্বপ্ন। স্বপ্ন বার্ণনাতেও নাটককারের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

মাধব- আচ্ছা, আচ্ছা ওকে বলতে দে না ওর স্বপ্নটা পরে দেখা যাবে কেমন। নন্তে তুই বল।

নন্টে- দেখি কি আমরা সবাই স্বর্গের সব দেবদেবীর বাহন হয়ে গেছি। যার যার দেব বা দেবী তারা তার পিঠের উপর। (প্রত্যেকেই যার যার মুখের দিকে তাকায়)

মাধব- তা কার পিঠে কোন দেবকে দেখলি?

নন্টে- দেখলাম তোমার পিঠে দুর্গা দাঁড়িয়ে অসুর বধ করেছেন।

মাধব- যাক্ আমি তাহলে সিংহ। আর তুই?

নন্টে- (লজ্জা পেয়ে) আমার পিঠে কার্ত্তিক আর আমি তাঁকে নিয়ে আকাশে।

ফন্টে- আকাশে? ..... নিশ্চয় ব্যাটার গ্যাস হয়েছিল। গ্যাস হলে নাকি স্বপ্নে ওরে..... ব্যাটা ময়ূর হয়েছে।

মাধব- আ: ফন্টে চুপ করণা-বাকিদের কথা বল।

নন্টে- মন্টের পিঠে কাকে যেন দেখলাম, হ্যাঁ মা লক্ষ্মী।

মন্টে- কী: আমি প্যাঁচা-মাধব দা দেখেছো তো ইচ্ছে করে আমাকে প্যাঁচা বানালো?

মাধব- বেশ তো তুই ধন-সম্পদ পিঠে নিয়ে থাকিস।

ফন্টে- আমাকে তা হলে দেখিস নি তো।

নন্টে- দেখিনি আবার। তোকে দেখি কি নদীর বাঁকে যে বট গাছটা আছে সেখানে তুই। পিঠি কে বুঝতে না পেরে এগিয়ে দেখি (সেবার আগ্রহ্য) তোর পিঠে বসে আছেন মা শী-ত-লা।

টিভিতে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রচার অনুষ্ঠান গুলিও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। বাসন মাজা ছাই থেকে আরম্ভ করে মাথার তেল, লটারীরর টিকিট, শিশুর পোলিও

খাওয়ানো, রক্তদান, কুষ্ঠ প্রভৃতি বিষয়ে জন সচেতনামূলক প্রচার রয়েছে নাটকটিতে।

অপর আর একটি নাটকের তিনি কোনো নামকরণ করেননি। আটটি দৃশ্যে মানব সভ্যতার সৃষ্টি থেকে তৎকালীন (নাটককারের) সময় পর্যন্ত খুব সুন্দর ভাবে, সীমিত বাক্যে, যুক্তিপূর্ণভাবে, স্তরে স্তরে সাজিয়ে দিয়েছেন। নাটকটি থেকে আদিম মানব জীবন, ক্রমান্বয়ে মানব সভ্যতার উন্নতি, রাজনৈতিক সামাজিক জীবন সম্পর্কে নাটককারের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম দৃশ্য- আদিম মানুষের প্রথম ধাপ।

দ্বিতীয় দৃশ্য- মানুষের জ্ঞানের বিকাশ। আশ্রম ভিত্তিক শিক্ষা, সকালে একত্রে মিলিত হয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্য- সমাজ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মবিভাজন, বর্ণবিভাজন শুরু হল। শুরু হল সম্পত্তির অধিকার, জমিদার প্রথা।

চতুর্থ দৃশ্য- মানুষের জাগ্রত বিবেক আনে আলো। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকৃত রূপ দেখা দিল। সৃষ্টির হয় অরাজকতা। মালিক র শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টির ফলে শ্রমিক শ্রেণী শাসিত ও লাঞ্ছিত হয়। শোষিত শ্রমিক শ্রেণী ভগবানের উপর বিশ্বাস ও পরজন্মে বিশ্বাস না করে পরবর্তী প্রজন্মকে পড়াশোনা শিখিয়ে শিক্ষিত করে তোলার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়। তারা লড়তে চাই মালিক শ্রেণীর সঙ্গে।

পঞ্চম দৃশ্য- সমাজে বর্ণপ্রথা মাথা চারা দিয়ে উঠেছে। শ্রেণী বৈষম্যে মানুষের মানবিকতা নষ্ট হয়েছে। অর্থের বিনিময়ে প্রায়শ্চিত্ত করলে আবার পাপ স্খলন হতে পারে মানুষের বিশ্বাস। নামারকম কুসংস্কার সমাজে প্রকট হয়ে উঠেছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য- দেখা দেয় সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহতা। ভারতে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদ মুখরীত জনগণ। চারিদিকে আন্দোলনের জোয়ার । রক্তঝরা আন্দোলনে ভারত স্বাধীন হল। মুক্তির আনন্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সপ্তম দৃশ্য- কিন্তু মুক্তির আনন্দ বেশিদিন থাকল না। বেকারত্ব, কর্মহীন দিন যাপন যুব সম্প্রদায়ের অন্ধকারে টেনে নিয়েছে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি নেমে এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের দেশের অস্থির অবস্থাটা তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টম দৃশ্য- যে সাম্প্রদায়িক বিষ বীজ বপন করে দেশ বিভাগ হয়েছিল সেই বিষ আমাদের শরীর থেকে এখনও মুছে যায়নি। হিন্দু মুসলমান যে দুটি ভিন্ন সম্প্রদায় তা যেন আমাদের রক্তে রয়ে গেছে। কিন্তু নাটককার আশাবাদী। তাই অষ্টম দৃশ্যের শেষে দেখা যায় সকলে বিভেদ ভুলে দেশ মাতার সেবায় উন্নতিকল্পে নিজেদের উৎসর্গ করার আহ্বান করেছে।

অমলেশ মিত্র - (১৯৩৭-২০১২):

অমলেশ মিত্র, ডাক নাম নারু। সদা প্রফুল্ল উদার প্রাণ অমলেশ মিত্রের দক্ষিণ দিনাজপুরের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রয়েছে। বালুরঘাট শহরে ১৯৩৭ সালের ১২ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভূদেব চন্দ্র মিত্র, মাতা হেমপ্রভাদেবী। বালুরঘাট হাইস্কুলের থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজের পড়াশুনা তিনি শেষ করতে পারেননি আর্থিক দুঃবস্থার জন্য। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি অভিনয় শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে পরেন।

১৯৫৭ সালে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সমাহর্তালয়ে কনিষ্ঠ কেরাণী রূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯৯৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। অমলেশ মিত্র একাধারে নাটককার পরিচালক ও অভিনেতা। তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁর অভিনীত নাটক - 'ঝুমুর' (ফটিক), 'পথের দাবী' (সব্যসাচী), 'নটি বিনোদিনী', 'ছেঁড়াতার' (রহিমুদ্দিন), 'পোষ্ট মাস্টার' (পোষ্ট মাস্টার), 'নীল দর্পন' (রায়চরণ), 'প্রদোষে প্রভাত' (শশীবাবু), 'সেমসাইড', 'গুলশন', 'রাজ দর্শন' প্রভৃতি। বেশ কিছু নাটক পরিচালনা করেছেন - 'পথের দাবী', 'নিস্কৃতি', প্রদোষে প্রভাত', 'কাবুলিওয়ালা', 'কেউ কথা রাখেনা' প্রভৃতি। গায়ক, অভিনেতা ও পরিচালক প্রণব চক্রবর্তীর ভাষায় '' অভিনেতা হিসেবে অসাধারণ। পরিচালনা করেছেন, তবে উল্লেখযোগ্য তাঁর অভিনয়। অমলেশ মিত্র গুণী লোক ছিলেন''।[৩৩] অসাধারণ কৌতুক প্রিয় নাট্যশিল্পী অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী অমলেশ মিত্র ছয়ের দশকে বালুরঘাট শহরের পাড়ায় পাড়ায় গ্রামাঞ্চলে নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৬৫ সাল থেকে আমৃত্যুকাল বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে সদস্য ছিলেন এবং কখনো নাট্য মন্দিরের সম্পাদক, কখনো কার্যকারী কমিটীর সদস্য হিসেবে উক্ত সংস্থাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

অমলেশ মিত্র তাঁর নাট্য জীবনে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৭০ সালে পাটনা শিল্পী সমিতি আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতায় 'ছেঁড়াতার' নাটকে 'রুহিমুদ্দী' - এর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত হন। District Police Aword পান ২০১১ সালে। বাংলা - ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্যোগে নর্থবেঙ্গল ভিশন আয়োজিত ''উত্তর বঙ্গ গৌরব সম্মান - ২০১১' পান।

নাটককার অমলেশ মিত্রঃ

অভিনেতা পরিচালক অমলেশ মিত্র কয়েকটি নাটকও রচনা করেছেন। ১৯৬৬ সালে PSU এর State Conference হয় বালুরঘাটে। ড: নিহাররঞ্জন রায় এসেছিলেন এই Conference এ। PSU কর্মকর্তা অমলেশ মিত্রকে একটি নাটক লিখতে অনুরোধ করলে তিনি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'নিস্কৃতি' কবিতাটির নাট্যরূপ দেন। 'নিস্কৃতি' অমলেশ মিত্রের প্রথম নাটক। নাটকটির বিষয় বস্তুতে আছে বিধবা বিবাহকে সমর্থন ও বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথার বিরূদ্ধে প্রতিবাদ। নাটকটি অমলেশ মিত্র মহাশয়ের পরিচালনায় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হয়। তাঁর প্রথম দিকের নাটক গুলি কোনো না কোনো প্রেরণায় লেখা। 'নিস্কৃতি'র পরে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোষ্টমাষ্টার' ও 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্পের নাট্যরূপ দেন। দুটি নাটকই নাটককারের পরিচালনায় নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়। নাটককার অমলেশ মিত্র বাউল লালন

ফফিরকে নিয়ে লেখেন 'লালন'(১৯৭৩)। নাটককার অমলেশ মিত্রের পরিচালনায় ও নাট্যমন্দিরের প্রযোজনায় জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনীত হয়। ১৯৭৫ সালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রকম আন্দোলন, ক্ষোভ-বিক্ষোভ দানা বেধে ওঠে। এই উত্তালের সময় বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা বিরোধী সত্যাগ্রহ ধাঁচের আন্দোলন চলছিল দিল্লিতে। ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি। মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার হারায়। এইরূপ পরিস্থিতিতে বামপন্থী প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এই জরুরী অবস্থায় (Emergency period) দীপঙ্কর ব্যানার্জীর অনুরোধে নাটককার শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র নাট্যরূপ দেন। 'পথেরদাবী' ছিল তৎকালীন সময়ের প্রতিবাদ স্বরূপ। নাটকটি তাঁরই পরিচালনায় ১৯৭৬ সালে নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়। এই সময়ে লেখেন 'আখের স্বাদ নোনতা' কিন্তু নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি।

নাটক শিক্ষাবিস্তারে, কতটা ভূমিকা নিতে পারে তারই প্রমাণ রয়েছে তাঁর 'প্রদোষ প্রভাত' নাটকটিতে। নাটককারের পরিচালনায় নাট্যমন্দিরের পক্ষ থেকে নিজেদের ব্যয়ে বালুরঘাট সব-ডিভিশনের সমস্ত ব্লকে অভিনীত হয়। এরপর তিনি লেখেন 'কেউ কথা রাখেনা'(২০০৪)। নাটকটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নাটক। নাটককার অমলেশ মিত্রের নাটক রচনার বিশেষ মোর নিয়েছিল তাঁর নাট্যজীবনের শেষ পর্যায়ে। তিনি মহামানব শ্রীশ্রী বাবা লোকনাথের জীবন ও সাধনাকে বিষয়বস্তু করে রচনা করেন-''বারদীর ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ''। তাঁর জীবৎকালে নাটকটি অভিনীত হয়নি। ১২ই আগষ্ট ২০১২ সালে পরলোক গমন করেন।

নির্মলেন্দু তালুকদার (১৯৩৮-):

প্রাবন্ধিক, অভিনেতা নাটককার নির্মলেন্দু তালুকদার ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার রক্ষিতবেলতা (সন্তোষ) গ্রামে ১৯৩৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সতীশ চন্দ্র তালুকদার, মাতা বনলতা দেবী। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সন্তোষ জাহ্নবী হাইস্কুলে প্রাথমিক বিভাগে পড়াশোনা করেন। ১৯৫৬ সালে বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল দেন। এর পরে প্রথমে সিটি কলেজ থেকে I.A, বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে শিক্ষক হিসেবে বসিরহাট হাইস্কুলে শিক্ষাকতা করার পর জগদ্বন্ধু ইন্সটিটিউশন, মদারাই হাইস্কুলেও শিক্ষাকতা করেছেন। পরে ১৯৬৮ সাল থেকে বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং অবসরের পর উত্তরবঙ্গ ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীন বালুরঘাট কলেজে স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করছেন।

নির্মলেন্দু তালুকদারের বাড়িতে নাটকের চর্চা ছিল। বাবা সতীশচন্দ্র তালুকদার এবং বড়দাদা সুধাংশু কুমার তালুকদার অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে অভিনয়ও করেছেন। তাঁর প্রথম অভিনয় ১৯৫২ সালে 'সিরাজের স্বপ্ন' নাটকে। দ্বিতীয় অভিনীত নাটক নিতাই ভট্টাচার্যের 'সংগ্রাম' নাটক, সময় ১৯৫৫, পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রথমে 'তরুণতীর্থ' (১৯৫৩), কলকাতার গণনাট্যসংঘের শাখা 'রঙ্গশীর্ষ'

সংস্থা এবং সর্বশেষে বর্তমানে 'ত্রিতীর্থ' নাট্যসংস্থার সঙ্গে জড়িত। 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯) নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। তরুণতীর্থের 'শেষ কোথায়', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'হাইপারবোল', 'চকমকি' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। ত্রিতীর্থে তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনীত নাটক গুলি হল - 'জল', 'বৃষ্টি', 'ওম', 'শিশুপাল', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জুরী', 'ক্ষুরস্যধারা', 'দেবীগর্জন,' 'দেবাংশী', 'করকুহক' ইত্যাদি। তিনি ১৯৫২ - ২০০৮ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ৫০ টি নাটকে ছোটবড় চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয় মহাশ্বেতা দেবীর 'জল' নাটকে সন্তোষ পূজারীর চরিত্রে।

তিনি নাটক লেখা ও অভিনয়ের প্রেরণা সম্পর্কে স্বীকার করেছেন, '' নাটক লেখার অনুপ্রেরণা পাই পারিবারিক নাট্যপরিবেশ থেকেই। খুব ছোট হলেও দেশের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় বাপ-জেঠারা মিলে নাটক করতেন। রাত জেগে ঐ সব নাটক দেখে এই শিল্পের প্রতি মনে মনে এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। দেশ বিভাগের পরেও বাবা এখানে (বালুরঘাটে) এসে অভিনয় করতেন। আমার বড়দা ও ছোড়দা ছাত্র জীবনে সখের থিয়েটারে অভিনয় করতেন। আমার ছোট ভাইও আমার সঙ্গে নাটক করেছেন। এরপর হরিমাধরের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সূত্রে নাট্যকলার প্রতি আকর্ষন এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে দু'জনে কলকাতা গিয়েও বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় দেখেছি এবং মাধব নিজেও 'নট নাট্টমের' প্রযোজনায় নাটক করেছে। এরপর ১৯৬৮ সালে বালুরঘাটে ফিরে এস প্রথমে নাট্যমন্দির এবং তারপর 'ত্রিতীর্থ' প্রতিষ্ঠার পর এখনও এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় নাট্যচর্চা নিয়ে রয়েছি। কলকাতাতে I.A. পড়তে যাই ১৯৫৬ সালে। সেখানে থেকে মাঝে মাঝে নাটক লিখতাম। অন্তিম তরফদারের বাড়ি, হরিমাধব মুখার্জীর বাড়ি, মন্টু কর্মকারের বাড়িতে বসে বসে আমি নাটক লিখতাম। একটা একটা নাটকের অংশ বিশেষ লিখতাম, ঐ অংশের আবার রির্হাসেল হয়ে যেত। এই ভাবেই আমি নাটক লিখতাম।''[৩৪]

নির্মলেন্দু তালুকদার একাধারে নাটককার, কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক। তাঁর রচিত নাটক গুলি ঃ-

মৌলিক নাটক:

১) শেষ কোথায় - ১৯৫৬/৫৭
২) ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি - ১৯৬০
৩) ওম - ১৯৬৯
৪) ধাক্কা (পথ নাটক) - ১৯৮৬
৫) ভোর (পথ নাটক) - ১৯৮৮
৬) প্রতিশোধ (বেতার নাটক) ১৯৯০/১৯৯১

নাট্যরূপ:

১) ছুটি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) - ১৯৭০
২) টোপ (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) - ১৯৭১
৩) শুধু কেরাণী (প্রেমেন্দ্র মিত্র) - ১৯৭৬
৪) ধলাদ্রব্য (নরেন্দ্র মিত্র) - ১৯৮২
৫) দেনাপাওনা (রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর) - ১৯৯২

শেষ কোথায়: স্বাধীনোত্তর বাংলায় আর্থসামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং মানুষ্যত্বের যে অবমাননা তাকে কেন্দ্র করে ''শেষ কোথায়'' নাটকটি রচিত। নাটকটি ১৯৫৫/ ১৯৫৬ সালে তরুণতীর্থের প্রযোজনায় আদর্শ স্কুলের মাঠে মুক্ত মঞ্চে অভিনীত হয়েছে।

চরিত্র:- নাটকটিতে ১৫/২০ জন অভিনেতা অভিনেত্রী ছিল। উদ্যোক্তাদের পরিবার থেকে মহিলা শিল্পী জোগার করা হয়েছিল। প্রধান চরিত্র অবিনাশ ও করালী প্রধান মহিলা চরিত্র ছায়া।

ভাষা:- নাটকটির ভাষা চলিত বাংলা ভাষা।

অঙ্ক:- পঞ্চাঙ্কের নাটকটিতে দৃশ্য সংখ্যা -

প্রথম অঙ্ক - ৩টি
দ্বিতীয় অঙ্ক - ৩টি
তৃতীয় অঙ্ক - ৪টি
চতুর্থ অঙ্ক - বড় ১টা
পঞ্চম অঙ্ক - ২ টি

কাহিনি: -

নাটকে দেখা যায় অবিনাশের পরিবারে পারিবারিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমশ যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার একটি আশঙ্কার মেঘ ঘনিভূত হয়েছে। অবিনাশ এবং তার স্ত্রীকে (ছায়া) শেষ পর্যন্ত পারিবারিক কূটনৈতিক চালে গৃহহীন হতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পুত্র বধূ মানবীর মহানুভবতায় অবিনাশ এবং ছায়া সংসারে ফিরে আসলেও কোথায় যেন সংকটময় সময়ে তাদের মনে হতে থাকে অদূর ভবিষ্যতে এই রকম যৌথ পরিবার ক্রমশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সব সংসারে আর তো মানবীর মত বৌ থাকবে এমন কথা নেই। জোড়াতালি দিয়ে সংসার করা কি সম্ভব? অবিনাশ ভাঙ্গা মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুই হাত উর্দ্ধে তুলে যেন ঈশ্বরের কাছে বলছেন এর শেষ কোথায়?

ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি: স্বাধীনতার অবব্যহিত পরবর্তীকালে বাংলার অর্থ সামাজিক যে সংকট দেখা যায়, তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিম্ন মধ্যবিত্তের শিক্ষিত পরিবার গুলি। এই প্রেক্ষাপটেই একজন শিক্ষকের পারিবারিক বিপর্যয়ের নাট্য কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

কাহিনি: -

সতীশ মাষ্টার একজন সদ্য উদ্‌বাস্তু আদর্শবান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সমাজ ও পারিবারিক জীবনে প্রতিদিনের কর্মক্ষেত্রে তিনি যে লোভ, হিংসা প্রতারণা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ক্রমশ সংসার ও কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। একদিকে যৌথ পরিবারের কিছু সদস্য এবং অন্যদিকে চাকুরী স্থানের কিছু ধান্দাবাজ মানুষের ষড়যন্ত্রে ক্রমশ নিজেকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে থাকেন। তাঁর মনে হয় নতুন যুগ ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি চলতে পারছেন না। সবাই তাঁকে ব্যবহার করছে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মত। নাটকটি শেষ হয়েছে সতীশের এই মানসিক যন্ত্রণার ট্রাজিডি বুকে নিয়ে।

অঙ্ক:-
নাটকটিতে তিনটি অঙ্ক রয়েছে। অঙ্গগুলিতে কোনো দৃশ্য নেই। একটানা তিনটি অঙ্কে নাটকের সমাপ্তি।

ভাষা:- নাটকটিতে মিশ্র বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত পরিবারের কর্তা সতীশ মাষ্টার এই ভাষার কিছু সংলাপ বলেছেন। তাঁর স্ত্রী বনলতাও বঙ্গালী উপভাষা এবং রাঢ়ী উপভাষায় সংলাপ বলেছেন।

সংলাপ:-

সতীশ মাষ্টার: (ক্ষুধার্ত সতীশ মাষ্টার প্রবেশ করেন) বড় বৌ বড় খিদা পাইছে। বাতনি (ভাত) হইছে? তাড়াতাড়ি কর। পুলাপান গুলান কি খাইচ্ছে? ছোট মাইয়াডা ঘুমাইছে কি?

বনলতা:- আরে চিল্লাও কেন? কলতলায় জল তোলা আছে। হাত মুখ ধুইয়্যা গামছা খান নিয়্যা তাড়াতাড়ি মুখ মুইছ্যা আহ আমি বাত বাড়ছি।

ওম: ক্ষুধার রাজ্যে একজন চোরের ঘন্টা দুই- এর অভিজ্ঞতার কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। পৌষের প্রবল শীতে ক্ষুধার্ত এক ছিচ্‌কে চোর একজন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি ঢুকে পরে। বাড়িটিতে গৃহস্থ এবং তাঁর পুত্র ছাড়া আর কেউ নেই। পুত্রটি চাকুরীসূত্রে বাহিরে থাকে। ছুটিতে বাড়িতে আসার খবর পেয়ে বাবা তাকে আনতে যান। অরক্ষিত বাড়িতে ঢুকে যায় চোরটি। প্রায় নগ্ন শীতার্ত চোরটি একদিকে যেমন খিদের জ্বালায় রান্নাঘরে ছুটে যায় তেমনি যাওয়ার পথে পরিপাটি করে সাজানো লেপকম্বল দেখতে পায়। চোর ভাবে কিছুক্ষণ লেপের ওম নিয়ে তারপর খাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত ক্ষুধার্ত গভীর ঘুমে অচ্ছন্ন হয়। বাবা এবং ছেলে ঘরে ফিরে এই দৃশ্যদেখে প্রথমে হতবাক হলেও পরে কিছুটা আন্দাজ করে তার (চোর) ঘুম না ভাঙ্গিয়ে নিজেরা হাত মুখ ধুয়ে তিনজনের মত খাবার বেড়ে চোরকে ভাত খাওয়ার জন্য ডাকে চোর হতভম্ভ হয়ে যায়।

অঙ্ক: একাঙ্ক নাটক ৪৫ মিনিটে নাটকটির সমাপ্তি।

চরিত্র:- তিন চরিত্র বিশিষ্ট।

ভাষা:- 'ওম' নাটকটির ভাষা চলতি সরল বাংলা ভাষা। তবে চোর চরিত্রটি মাঝে মধ্যেই স্বগতোক্তিতে উত্তর বঙ্গীয় ভাষায় কথা বলে।

সংলাপ:- গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন চোরকে ডেকে ভদ্রলোক বলেন।

ভদ্রলোক: এই যে বাবা জীবন অনেক রাত হয়েছে এবার ওঠ। বড্ড শীত পড়েছে, খেয়ে দেয়ে আবার লেপের নিচে ঢুকে যাওতো বাবা।

চোর: আজ্ঞে ..... আমি।

ভদ্রলোক: নানা তুমি কিছু না; তুমি এ সংসারের একজন, চল খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে গরম গরম খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। কাল থেকে আমার বাড়িতে কাজে লেগে যাবে।

ধাক্কা:- নাটককারের নিজের লেখা ছোট গল্প 'দেওয়াল' এর নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি স্বয়ং। ১৯৪৬ সালের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট কলকাতা, মজফ্ফরপুর, নোয়াখালিতে হিন্দু মসুলিম যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয় তাতে ভীত সন্ত্রস্ত সংখ্যা লঘু হিন্দু সম্প্রদায় গ্রামাঞ্চলের কিছু কিছু স্থানে সাধ্যমত দাঙ্গা বিরোধী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পূর্ববঙ্গের তৎকালীন টাঙ্গাইল মহকুমার রক্ষিত বেলতা গ্রামের জমিদার বাড়ির ছাদে এই রকম একটি মজবুত দেওয়াল গড়ে ওঠে। বহুবছর বাদে এই নাটকের প্রধান চরিত্র প্রৌঢ় বয়সে একটি গ্রাম্য যুবককে সঙ্গে নিয়ে সেই দেওয়াল দেখতে যান। শৈবাল আচ্ছাদিত দেওয়ালটি তখনও জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই প্রৌঢ় শৈশবের সেই স্মৃতিকে মনে করে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদের প্রতীক ঐ দেওয়ালকে সঙ্গী যুবক কাজলের সাহায্যে জোর থাকা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে।

অঙ্ক:- এক অঙ্ক বিশিষ্ট। পথ নাটক।
চরিত্র:- দু'জন চরিত্র, প্রৌঢ়-মিলন, ছেলেটি-কাজল।
ভাষা:- বঙ্গালী উপভাষা।

সংলাপ:-

কাজল- আপনারে আমি নতুন কাকা বইল্যা ডাকুম।
মলিন- তোমারে কেডা শিখাইল কওত?
কাজল- ক্যান মা শিখাইচে। ন্যান এবার চলেন তো আপনার সেই দেওয়াল না কী কইলেন য্যান, ঐ ডারে দেইখ্যা আসি। সাপ ক্ষোপের ভয় আচে।
মলিন - আরে থোউ তোমার সাপ ক্ষোপ - দেওয়াল যদি থাকে ওরে আমি আর তুমি এক ধাক্কাই ফ্যালইয়া দিমু নাও চল।

প্রথম অভিনয় - ১৯৮৮ সালে গণনাট্য সংস্থা এবং বাংলাদেশে নাটককারের জন্মভূমিতে বহুবার অভিনীত হয়েছে।

প্রতিশোধ: প্রতিশোধ একাঙ্কটি নাটককারের 'প্রতিশোধ' ছোটগল্প অবলম্বনে লেখা। এই নাটককের কাহিনির প্রেক্ষাপট স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তিকালের ঘটনা, সবেমাত্র দেশভাগ হয়েছে। পূর্ববঙ্গের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে অনেক হিন্দু পরিবারই নিরাপত্তার খাতিরে সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে চলে আসছে। গ্রামের সুতোরের ছেলে পাগ্যাইরা বাবার সঙ্গে ছোট খাট কাঠের কাজ করে, লেখা পড়া বিশেষ কিছু জানে না। কিন্তু তার হাতের মাটির কাজ খুবই প্রশংসনীয়। গ্রামে ধীরেন গুহের বাড়িতে কালী পুজোর প্রতিমা গড়ে সে। পাগ্যাইরার সকলে খুব প্রশংসা করে। মূর্তিকে সাজাতে গিয়ে ঠাকুর মশাই এর হাত লেগে

মায়ের (কালী) আঙ্গুলে চীর ধরে পাগ্যাইরা কোনো কিছু না ভেবে চট করে তার থলে থেকে রংতুলি বের করে কালীমায়ের হাত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনে। পুরোহিত মশায় এবং গায়ের মাতস্বরেরা পাগ্যাইর‍্যাকে যথেষ্ট জুতো পেটা করে এবং বাড়িতে বাবার হাতে বেদম প্রহার পায়। কয়েকদিন বাদে দেখা যায় ধীরেন গুহের পরিবার নৌকাযোগে ভারতের দিকে পাড়ি দিচ্ছে, আর পাগগাইর‍্যা নৌকায় মালপত্র তুলে দিচ্ছে। নৌকা ছাড়ার সময় হয়, কিন্তু ধীরেন গুহের কিশোরী মেয়ে টুনির দেখা নেই। মাঝিরা তাগাদা দেয়। টুনির বাবা মা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে একজন মাঝি টুনিকে জোর করে নৌকায় তুলে দেয়। কিন্তু টুনি তার গোপন প্রেম পাক্যাইরাকে ছেড়ে কিছুতেই যাবে না বলে মাঝ নদীতে গিয়ে ঝাপ দিয়ে সাতরে পারে এসে হাত পা ধুয়ে পাক্যাইরার হাত ধরে টুনি বাড়ির দিকে যায়।

চরিত্র:- নাটকের কাহিনি ও চরিত্র নাটককারের গ্রামের। নাটকে উল্লিখিত চরিত্রের মধ্যে কেউ কেউ এখনো বর্তমানে।

ভাষা:- বঙ্গালী উপভাষায় নাটকটি লিখিত।

সংলাপ:- টুনি নদীতে ঝাপ দেওয়ার পর পাড়ে এসে পাগ্যাইরাকে স্ব-স্নেহে বলেছে-

টুনি:- নও যাই, সারাদিনতো গাধার মত খাটলা। খিদানি পাইছে। টস্‌টসা কাচা লঙ্কা আর আলু সিদ্ধ দিয়ে বাত খাইবা প্যাট ভইর‍্যা।

নৌকা: 'নৌকা' নাটকটি এখনো অভিনয় হয়নি। নাটকটির প্রেক্ষাপটে রয়েছে ১৩৫০- এর বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ বাঙালীর মৃত্যের শোচনীয় ঘটনার পেছনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সরকারের কিছু ভ্রান্ত নীতি তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে হিন্দু মসুলিম ঐক্যে পরিবেশকে ও উপযুক্ত ভাবে নাট্যায়িত করা হয়েছে।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত হওয়ার অবব্যহিত পূর্বে বাংলার একটি গ্রামের ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ মৎস্যজীবী মানুষদের শুভদিনে প্রতিবছরের মত এবারও মৎস্য শিকারের পূর্বে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সংঘঠিত হয়। একটি সুখি গ্রাম কি ভাবে একের পর এক আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে অবশেষে প্রায় ধ্বংসের মুখে দাঁড়ায় -১৯৪৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নানা বিধ শোচনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে সংঘবদ্ধ হয়।

প্রকৃতি:- পঞ্চাঙ্কের নাটক। পাঁচটি অঙ্কে মোট ১৫টি দৃশ্য রয়েছে।

চরিত্র:- প্রায় ৩০ জন চরিত্র রয়েছে।

ভাষা:- নাটকের পটভূমি পূর্ববঙ্গ। তাই সব চরিত্র বঙ্গলী উপভাষায় কথা বলেছে।

সংলাপ:-

আমিনা - তরে অনেকদিন দেহিনা, কৈ গেছিলি?

ফরিদা - জামু আর কনে, আরাজান কৈল দ্যাশের যে হাল একটা কাজকাম জোটাইয়া নাও। তাই কলকাতার থলে মাস খানেক ঘুইরে আলাম। কিন্তু সে হানেও দুই মুঠা ভাতের জন্য হাহাকার।

আমিনা - থাইক। আর - যাওনের কাম নাই এ হানেই থিতু হইয়্যা বইস।

নাট্যরূপ- বেশ কিছু প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্পের মধ্যে যে নাট্য সম্ভাবনা রয়েছে, সে গুলি পড়ে নাটককার উপলব্ধি করেছিলেন যে গল্পগুলির নাট্য রূপ দিলে লেখকের বার্তা খুব সহজেই পৌঁচ্ছে যাবে মানুষের কাছে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কিছু ছোট গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন।

ছুটিঃ 'ছুটি' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) গল্পের ফটিকের ট্র্যাজিডি আসলে আমাদের শৈশবকে হত্যা করার এক মর্মান্তিক কাহিনি সেটি নাটককার নির্মলেন্দু তালুকদার নাট্যরূপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

টোপঃ 'টোপ' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) ছোট গল্পটি মর্মান্তিক নিষ্ঠুর পরিণতির কাহিনি। উত্তরবঙ্গের নীবিড় চা বাগান কেন্দ্রিক পরিবেশে একটি বাংলায় বাঘ শিকারের জন্য কি ভাবে অসহায়, সহায়-সম্বলহীন কুলিকামিনীর ছেলে মেয়েদের টোপ গেঁথে বাঘ শিকার করত এক নব্যবাবু এবং তারই কাহিনি তীব্র শ্লেষ এবং বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে যখন সেই বাঘেরই চামড়া দিয়ে জুতো তৈরী করে বন্ধু লেখককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গল্পের কাহিনি বজায় রেখে সুন্দর নাট্যরূপ দিয়েছেন নাটককার।

শুধু কেরাণীঃ 'শুধু কেরাণী' (প্রেমেন্দ্র মিত্র) একটি ট্রাজিক ধর্মী গল্প। দারিদ্রের অসহনীয় চাপে এক নিম্নমধ্য বিত্ত সুখি পরিবার কি ভাবে নির্মম পরিণতির শিকার হল নাটকটিতে তাই দেখানো হয়েছে।

ধলাদ্রব্যঃ 'একপো দুধ' (নরেন্দ্র নাথ মিত্র) ছোট গল্পটিকে 'ধলাদ্রব্য' নাম দিয়ে নাট্যায়িত করা হয়েছে। এখানেও এক দু:স্থ পরিবারের যে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বাংলার নিম্নবিত্ত ভদ্র শ্রেণীর পারিবারিক জীবনের শোচনীয় পরিণাম।

উক্ত ছোটগল্প গুলির নাট্যরূপ দেওয়ার পেছনে নাটককার যে দিকটিতে বেশি জোর দিয়েছেন, তা হল ট্রাজিডি এবং এই ট্রাজিডি উঠে এসেছে সমাজ ও জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে। মনে হয় নাটককারের উদ্দেশ্যে ছিল এগুলি (গল্প গুলিকে) বহু মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করা। কেন না সাহিত্যের এই ধারা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ঃ (১৯৪১--)ঃ

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরে ১৯৪১ সালের ৩রা এপ্রিল। পিতা নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়, মাতা সরোজিনী দেবী। বালুরঘাটের ভূমিপুত্র নাটককার, অভিনেতা, পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়-এর কৈশোর থেকে শুরু

হওয়া নাট্যচর্চা 'তরুণতীর্থ' থেকে যৌবনের 'ত্রিতীর্থ' প্রায় রূপকথার মতো সাফল্য। 'ত্রিতীর্থ' দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিনেতা নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রমী চিন্তা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে ত্রিতীর্থ সাফল্যের শিখর ছুয়েছিল। জন্মভুমি বালুরঘাট-তার মাটি, তার মানুষ, তার ডায়ালেক্ট থেকে রিচুয়াল- এই সমস্ত কিছু নিয়েই ত্রিতীর্থের প্রথম কলকাতা জয় পরে ভারত পরিক্রমা। সাত ও আটের দশকে ত্রিতীর্থ পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটারের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল। সাতের দশকের সেই উদ্যমী যুবক আজও সমান ভাবে অভিনয়, প্রযোজনা ও নাটক লিখে চলেছেন। যদিও কলকাতা সহ অন্যান্য যে কোনো স্থানের থিয়েটারের মত বালুরঘাটের টিকিট কাউন্টারে আর লম্বা লাইন দেখা দেখা যায় না। তবু প্রকৃত কিছু নাট্যামোদীর সামনে তিনি হাজির করেন নতুন নাটক কিংবা পূর্ব অভিনীত নাটক নতুন মোড়কে। মফ:স্বলের সংস্কৃতি চর্চা আসলে সংগ্রামের অন্য নাম। তবু শিল্প বোধ আর প্রাকরণিক দক্ষতায় কেউ কেউ শিখর স্পর্শ করেন। জীবনের নতুন মাত্রা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁদের উদ্যমে। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এই রকম একজন সংগ্রামী শিল্পী।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা। এখান থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। বালুরঘাট মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা শেষ করে ১৯৫৬ সালে কলকাতা যান। কলকাতায় তিনি প্রথমে সিটি কলেজে ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বানিজ্য বিভাগে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

১৯৬০ সালে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি বিভিন্ন রকমের কাজ করেছেন- সেলসম্যান, পোষ্ট মাষ্টার, স্কুলের শিক্ষকতা, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কেও চাকুরী করেছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি কলকাতা থেকে বালুরঘাটে ফিরে আসেন এবং প্রথমে স্কুলের শিক্ষকতা করেন পরে ১৯৬৮ সালে তিনি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। ১৯৬৯ সালে ২৪শে জানুয়ারী রীণা মুখার্জীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দুই মেয়ে, এক ছেলে।

তিনি ছেলেবেলা থেকে ব্যাটমিন্টন, ফুটবল খেলেতেন, তবলা বাজাতেন তবে নাটকের প্রতি তাঁর ছিল অস্বাভাবিক আকর্ষণ। তাঁর পিতাশ্রী অভিনয় করতেন। ''আমার পিতা মহাশয় অসম্ভব সৌম্য ও সুদর্শন ছিলেন, আর খুব ভালো গাইতেন-গায়ক অভিনেতা ছিলেন। অবশ্য আমি দেখেনি বাবার অভিনয়। শুনেছি বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে অভিনয় করতেন।''[৩৫]

তাঁর বাবার কীর্তন গানের দল ছিল সেই সূত্রেই ছোটবেলা থেকে অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৫০ সাল থেকেই তিনি নাট্যমন্দিরের অভিনীত নাটক দেখতেন। কিন্তু অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেননি। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালীন তিনি প্রথম অভিনয় করেন 'টিপুসুলতান' নাটকে। টিপুর শিশু সন্তানের ভূমিকায় অভিনয় দিয়ে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু। তিনি মঞ্চে ঘাবড়ে যেতেন না ও ভালো অভিনয় করার জন্য বড়দের সঙ্গে প্রায়ই অভিনয়ের সুযোগ পেতেন। বালুরঘাটে সেই শৈশব থেকে তিনি কিভাবে ধীরে ধীরে নাট্যব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন তা জানা যায় তাঁর নিজের কথায়- ''.. আশু বোস বলে একজন অনেক বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন এখানে, তিনি নিজে কোনদিন অভিনয় করতেন না কিন্তু অন্যদের অভিনয় শেখাতেন।

আমি বাবার কাছে আশুদার কথা শুনেছি, বাবা আশুদা বলতেন। আমি যখন থেকে নাটক দেখতে শুরু করেছি তখন বালুরঘাটে নাটকের অভিনয় একটা জমজমাট ব্যাপার। পুজোর সময় তিনদিন ধরে নাটক হতো। তিন-চার ধরনের নাটক- একটা সামাজিক, একটা ঐতিহাসিক, একটা হাসির, একটা পৌরাণিক- এই রকম আর কি। পুলিশদের একটা ব্যারাক ছিল, সেই পুলিশ ব্যারাকে এখন যেটা বালুরঘাট হাইস্কুলের মাঠ, ওই খানে তিন দিন ধরে থিয়েটার হতোই। সেখানে মোষ্টলি ঐতিহাসিক নাটক যেমন, 'টিপুসুলতান' বা 'বঙ্গেবর্গী' এই সব অভিনয় বেশী হতো। আর মোক্তার পাড়ার দিকে একটা পাল বাড়ি ছিল, পাল বাড়ির একটা পুজো হতো, আর সেখানেও থিয়েটার হতো একটা প্রাঙ্গনে। তো পুজো-পার্বন হলেই থিয়েটার হতো এবং সে থিয়েটার খুব যে হেলা ফেলার ছিল তা নয় বরং বেশ একটা চর্চা করে রিহার্সাল বেশী করে দিয়ে সিরিয়াসলি হতো, নিম্নমানের মোটেও নয়। তারপর আমরা যখন একটু বড়ো হলাম, আমার বয়স হার্ডলি কত হবে, তখন ধরো ক্লাস-সেভেনে পড়ি। তখন সে সব অভিনয় আমার উপরে দারুণ প্রভাব ফেলত। আমি প্রায়ই রিহার্সালে বসে থাকতাম। এর ওর পান আনতাম, কারও বিড়ি এনেদিতাম। একটু আধটু কাজ করে দিতাম। কিন্তু আমার ইন্টারেষ্ট ছিল ওই রিহার্সালে, দেখতে দেখতে মুখস্ত করে ফেলতাম এক একটা গোটা নাটক। এইখানে এই ঘরের বাইরেটায় একটা বড়ো চৌকি থাকত, তখন এটা ঘর ছিলনা, বারান্দা ছিল। সেই চৌকির উপরে আমরা শাড়ি টাঙিয়ে আমার খুড়তুতো দাদাদের সঙ্গে তাঁরা বয়সে আমার বড়োই ছিল- আমরা একসঙ্গে সেই রিহার্সালে শোনা নাটক গুলি অভিনয় করতাম। এমনিভাবেই আমার থিয়েটারের সঙ্গে একটা নাড়ির টান জন্মে গেল। কেউ আমাকে হাত ধরে থিয়েটারে আনেনি, আমি নিজেই চলে এসেছি ওই টানে। সেই অর্থে থিয়েটারে আমার কোন গুরু নেই।

এমনটা করতে করতেই তখন হয়ত ক্লাস সিক্স -সেভনই হবে একটা দল করে ফেললাম আমরা কয়েকজন তরুণরা। তরুণতীর্থ নাম দিয়ে বেশ নিয়ম করে লিফলেটের মতো ছাপিয়ে এবং লিখেটিকে মাঠে অভিনয় করে বেড়াতাম। এটা করতে করতেই জানিনা কেমন করে থিয়েটারের মধ্যে ঢুকে গেলাম, আজও পর্যন্ত আর সেটা আমাকে ছাড়েনি।''[৩৬]

যখন তিনি কলকাতায় পড়তে গেলেন তখন থেকেই তিনি প্রচুর পরিমাণে কলকাতার থিয়েটার দেখতে শুরু করেন। সেই সময় 'বহুরূপী', 'নান্দীকার', উৎপল দত্তের 'এল.টি.জি.', 'শৌভনিক', 'গন্ধর্ব', 'নক্ষত্র' এই সমস্ত দলের থিয়েটার দেখতে শুরু করেন। আবার এর সমান্তরাল ভাবে বালুরঘাটে তাঁর নিজের থিয়েটার থেমে থাকেনি। তিনি পুজোর ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটি কিংবা যে কোনো ছুটিতে বাড়িতে এসে থিয়েটার করতেন। দলবল রেডিই থাকত, তিনি নাটক নির্বাচন করে আনতেন। ছুটির মধ্যে নাটক রিহার্সাল করে নাটকে অভিনয় করতেন।

''যৌবন উন্মেষে আমি ১০ বছরের অধিক সময় কলকাতায় কাটিয়েছি-পড়াশোনা, চাকরি নানা সূত্রে। তখন কলকাতায় আমার সময় কাটত নাটক, সিনেমা, জলসা, সঙ্গীত সম্মেলন, ফুটবল খেলা দেখে- পড়াশোনা ছিল Secondary issue। পেশাদার, গ্রুপ থিয়েটার সবই ছিল দ্রষ্টব্য স্থান। গ্রুপ থিয়েটার এবং সিনেমাতো বটেই। বাংলা নাটকে পেশাদার অপেশাদার এমন কোনো শিল্পী ছিলেন না যাঁর অভিনয় আমি দেখেনি। দেখতাম শেখবার

জন্য। নিজের অজ্ঞতা সীমাবদ্ধতা সঠিকভাবে বুঝে নেবার জন্য। বুঝতে পারতাম নাটক অভিনয়, পরিচালনা কী, কেমন -আর আমরা এখানে কী করি, দেখি। একটু একটু করে গোপনে নিজেকে শিক্ষিত করার চেষ্ঠা করতাম। শ্রুতি, দর্শন জ্ঞানলাভের এই পর্বের সঙ্গে যুক্ত করি পঠন। Total Theatre এর concept এর চক্রব্যুহে ঢুকে পড়লাম। ৬৭/৬৮ তে আমি স্বভূমিতে ফিরে স্থিত হই তখন আর আগের আমি নেই। একটা Metamorphosis ঘটে গেছে আমার মধ্যে। দেখে, পড়ে, অনুশীলন করে তখন আমি এমন এক চৌরাস্তায় পৌঁছেছি যখন নাটক আর আমার কাছে শখের কোন খেলা নয়, অবসর বিনোদনের মাধ্যম নয়, অগাধ অপরিমেয় এক জ্ঞান সমুদ্র''[৩৭]

এই সময় তিনি নিজেকে স্থির করতে পারছেন না, কলকাতার কোন সংস্থায় নাটক করলে ভালো হয়। শিশির সেন তাঁকে 'গণনাট্য সংস্থার' অফিসে নিয়ে যান। সেখানে তিনি কোনো অভিনয় করেন নি। পোষ্টার লেখা, পোষ্টার সাটা এই সমস্ত কাজকর্ম করতেন। এখানে তিনি এক বছর ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি হাওড়ার শিবপুরের কাছে মামার বাড়িতে থাকতেন তখন তিনি একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেন। এই সময় তিনি জগমোহন মজুমদারের সহযোগিতায় 'নটনাট্যম' নাট্যসংস্থায় প্রবেশ করেন এবং সেখানে তিনি অভিনয়ও করেছেন। দুই-তিন বছর অভিনয় করার পর ১৯৬৭ এর শেষের দিকে তাঁর মেজদার মৃত্যু ঘটে। এই সময় তিনি বালুরঘাটে চলে আসেন এবং বালুরঘাটের একটা স্কুলে চাকরি নেন। 'তরুণতীর্থ'(১৯৫৩) নাট্যসংস্থাটিকে রেজিষ্টার করালেন। এখানে অভিনীত সমস্ত নাটকের তিনি পরিচালনা করতেন এবং অভিনয়ও করতেন। প্রভাস সমাজদারের অনুরোধে তিনি ১৯৬৮ সালে নাট্যমন্দিরে যোগদান করেন। ''বস্তুত প্রভাসদার আগ্রহাতিশয্যে আমি ৪ আনার সদস্যপদ নিয়ে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করলাম''[৩৮]।

নাট্যমন্দিরে তাঁর স্থিতিকাল ১ বছর ২মাস। এই সময় পর্বে তিনি নাট্যমন্দিরে 'অমৃতঅতীত', 'লৌহপ্রাচীর', 'চারপ্রহর', 'ছায়ানায়িকা', 'কেয়াকুঞ্জ'- এই পাঁচটি নাটক পরিচালনা করেছিলেন। 'অমৃত অতীত', 'লৌহপ্রাচীর','চারপ্রহরে' অভিনয় করেন। নাট্যমন্দিরে রাজনীতির অনুপ্রবেশ তিনি মানতে পারেননি। তাই তিনি নাট্যমন্দির ত্যাগ করেন। 'তরুণতীর্থ', ত্রিশূল' ও নাট্যমন্দিরের কিছু সদস্য মিলে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় গড়ে তোলেন 'ত্রিতীর্থ' নাট্য সংস্থা। সময় ১৯৬৯ সাল।

নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ঃ

'তরুণতীর্থ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নির্দেশক হিসেব নিজেকে নিয়োজিত করেন। 'তরুণতীর্থের সমস্ত নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন। 'বন্দীবীর', 'আক্কেল সেলামী', 'পাপ ও পাপী', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'পাখির বাসা', 'করুণা করো না, 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র', রজনীগন্ধা' প্রভৃতি নাটকের পরিচালনা করেছেন। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে পরিচালনা করেছেন 'অমৃতস্য পুত্রা:', 'অমৃত অতীত', 'চারপ্রহর', 'লৌহপ্রাচীর', 'ছায়ানায়িকা'। 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি 'ত্রিতীর্থ' প্রযোজিত সমস্ত নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন। ''জন্মলগ্ন থেকেই ত্রিতীর্থ আমাকে পরিচালক পদে নিযুক্ত করেছিল। ১৯৬৯ থেকে আজ পর্যন্ত সেই পদেই বহাল আছি। যদিও ত্রিতীর্থের

সংবিধানে পরিচালক পদের উল্লেখ নেই-তবু সদস্যদের সর্বসম্মত ইচ্ছানুযায়ী পঁচিশ বছর আমি এই দায়িত্ব পালন করে চলেছি''[৩৯]।

১৯৬৯সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তও তিনিই পরিচালনা করে চলেছেন।কালিয়াগঞ্জের 'অন্যন্য' থিয়েটারে 'সন্ন্যস্ত' এর নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশনায় ত্রিতীর্থের মাধ্যমে বালুরঘাট শহর ভারতের সংস্কৃতিক পরিমন্ডলে স্থান পেয়েছে।

'ত্রিতীর্থ' প্রযোজিত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়য় নির্দেশিত'ভাঙ্গাপট' ৭০ এর দশকে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। কলকাতা সহ সব শহরের নাট্যমন্দিরদের সচকিত করে তোলে। ''আমাদের এই দেশে ক্লাইস্ট এর পরিচিত নাট্যকার হিসেবে। আর আমার ধারনা ক্লাইস্ট এর নাটক ভারতে প্রথম মঞ্চস্থ করে ত্রিতীর্থ''[৪০]। 'দেশ'-এ শোনা যায় 'ভাঙ্গাপট' প্রযোজনা সম্পর্কে ''কলামন্দিরে কলকাতার হার''[৪১]।

'দেবীগর্জন' নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার সাক্ষর রেখেছেন হরিমাধব মুখোপাধায়। ''নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের অভিনীত এবং নির্দেশিত ক্যালকাটা থিয়েটার্সের বিখ্যাত প্রযোজনা 'দেবীগর্জন'ও তাঁদের অন্যতম। কিন্তু ত্রিতীর্থের 'দেবীগর্জন' স্বতন্ত্র প্রযোজনা। বিজন ভট্টাচার্যের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব থেকে নিজেকে টেনে এনে নতুন ভাবে এ নাটকের মঞ্চ প্রতিষ্ঠা নি:সন্দেহে দু:সাহসিক প্রয়াস''[৪২]।

নাটককার, অভিনেতা, নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনা ও ত্রিতীর্থের প্রযোজনায় একটি শক্তিশালী ও বৃহৎ নাটক 'গ্যালেলিও'। পরিচালকের কথায় ''গ্যালেলিও ইজ এ চ্যালেঞ্জট টু মি। কোনো গ্রুপ থিয়েটার শুধু-শুধু-শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষের কোনো গ্রুপ থিয়েটার আমাদের আগে, ১৯৭৮ এর আগে গ্যালিলিও করেনি''[৪৩]।

''ব্রেশটের 'গ্যালিলিও গ্যালিলেই' সবার আগে ত্রিতীর্থ মঞ্চায়িত করে। পিরিয়ড প্রোডাকশান এটি। নির্দেশক ও অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায় গ্যালিলিওকে পিরিয়ডের পোষাক খুলে আজকের জীবনের পোষাক পরিয়েছেন, সেই সঙ্গে গ্যালিলিওর দ্বন্দ্বটিকে সহজবোধ করে তোলা গেছে''[৪৪]। অভিজিৎ সেন ত্রিতীর্থের 'জল' নাটকের প্রযোজনা প্রসঙ্গে বলেছেন-''ত্রিতীর্থের মাথার মুকুট জল। মহাশ্বেতা দেবীর স্বহস্তকৃত নাট্যরূপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরো পরিবর্তিত সংযোজন প্রয়োজনে পরিচালক হরিমাধব মূল নাটকের এবং গল্পের যতগুলো সম্ভাবনা ছিল সবগুলোকে ব্যবহার করে একটি প্রায় তিন ঘন্টার ত্রুটিহীন নাটক উপহার দিয়েছেন দর্শকে। মঞ্চ ব্যবহারের একটি নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন পরিচালক। অভিনেতারা প্রত্যেকটি চরিত্রেই পরিচালকের দাবী পূরণ করেছেন। অসাধারণ 'জল'-র নাচ এবং গান, বৃষ্টির দৃশ্যে কর্মরত পুরুষ ও রমনী। অভিভূত করে মঘাইয়ের জলান্বেষণ, মনসা পূজার আয়োজন, বাঁধ বাঁধার দৃশ্য। হোলির দৃশ্যে সমস্ত মঞ্চ জুড়ে প্রায় ৫০জন কুশলীবের নৃত্য গীত এবং আনন্দ উৎসবের বর্ণাঢ্যতা ভাবা যায় না। সবশেষে সংঘর্ষের দৃশ্যটি এবং মঘাইয়ের চরসা নদীতে আত্ম বিসর্জন দর্শক এক গভীর আবেগে আপ্লুত হয়। বক্তব্যে, অভিনয়ে, নৃত্যগীতে, মঞ্চ পরিকল্পনায় এবং আলোক সম্পাতে জল একটি অসামান্য প্রযোজনা''[৪৫]।

'জল' নাটকের সমালোচনায় আনন্দবাজার পত্রিকার রবিশংকর বল এর মন্তব্য ও প্রণিধানযোগ্য-''জল নাটকটির সৃষ্টির পিছনে নাট্যকার, নির্দেশক ও ত্রিতীর্থ যে কোন কল্পিত ধারণা বা ইলিউশনের দ্বারা চালিত হননি তা বোঝা যায় নাটকের গভীর গঠনে। অভিনয় থেকে শুরু করে প্রযোজনার কোনোও ক্ষেত্রেই চড়া পর্দার ব্যবহার নেই। চরসা গ্রামের মানুষদের সাংস্কৃতিক দিকটি উঠে আসে, গ্রামের সঙ্গে একটানা গানের সুরের ব্যবহারে, জলের গোপন উৎস খোঁজার সময় মনসার গানে ও বাঁধ তৈরির পরে মিলনোৎসবের মুখরতায়।বস্তুত পক্ষে জল বাস্তব নির্ভর একটি ডকুমেনটেশন। ..... 'জল' এমনই একটি সর্বতোভাবে সার্থক প্রযোজনা যার কোনো একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা প্রায় অসম্ভব''[৪৬]।

পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের একটি কালজয়ী প্রযোজনা 'দেবাংশী'। নাটককার পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিজের ভাষায় ''নিজেদের লেখা নাটক ক্রমাগত করতে থাকি। করতে করতে একটা সময় ধর যেটা বুম করল সেটা দেবাংশী''[৪৭]। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা হল দেবাংশী নিয়ে। 'অন্যদিন' পত্রিকায় দীপক রক্ষিত বললেন ''অভিজিৎ সেনের গল্পের অনন্যতাকে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটকে যে ভাবে তুলে ধরেছেন তা মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে, এবংTragedy তে ভরে উঠে মন। আবার অনাবিল আনন্দ হয় যখন দেখি দেবাংশী দেবত্বের আবদ্ধতা থেকে বেড়িয়ে মানুষ 'সারবান লোহার' হয়। .... পরিশেষে পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে অসংখ্য সাধুবাদ জানাই এমন অনন্য নাটক পরিচালনা, মঞ্চ ও Music -এর ভিন্নতা, সুন্দর পরিশীলত Mass Scenc সৃষ্টির জন্য। বিশেষ করে দেবেন মন্ডলের তাবিজ নিয়ে চিন্তায় Musical effect এবং স্ত্রীর কাছে মানুষ দেবাংশীর আর্জি- দেশজ সানাই- এর effect-এ হাহাকারে সুরের নান্দনিক স্পর্শ বহুকাল মনে থাকবে।''[৪৮]

আনন্দবাজারে শোনা গেলে ''.... অভিজিতের কাহিনীকে নাট্যে এনেছেন হরিমাধব। সংলাপ ওঁর। নাট্যশরীর রচনা ওঁর। আবহের ওঠা-নামার খেলাটিতেও রয়েছে ওঁরই ঐন্দ্রজালিক ভাবনার বিকাশ। সবশেষে নির্দেশনা। সেটুকুও হরিমাধবের অধিকারেই। যেহেতু ত্রিতীর্থ জানে, বিয়াল্লিশ জন জীবন্ত মানুষকে আলাদা আলাদাভাবে দীপ্যমান করেও বিচলনে, শিল্পীর বিন্যাসে, চিত্রকল্প রচনায় পর পর গুরুত্ব এনে একটি সুসংহত সংঘবদ্ধ শক্তির বিকাশ ঘটানো কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব''[৪৯]।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ তাঁর 'দেবাংশী'কে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার স্বীকৃত দিয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী রচিত 'বিছন' ছোটগল্পের নাট্যরূপ দিয়ে নাটকটিতে মঞ্চায়িত করার মধ্যে নাটককার পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ''হরিমাধব মুখোপাধ্যায় যে নাটকগুলি নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁর মধ্যে হিন্দি নাটক 'বিছন ' অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। মঞ্চে বিহারের রুখাসুখা পরিবেশ অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছিলেন। সময় ক্ষেপন, দৃশ্যগুলি পরপর যে ভাবে এসেছে সঙ্গে আলো এবং আবহের ব্যবহার পরিচালককে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। যে দৃশ্যে লছমন সিং দুলনের হাতে কুদাল

তুলে দেয় এবং মাটি খুঁরতে বলে। দুলন কোদালটা তোলে মাটিতে কোদালটা পড়ে ইঙ্গিত পূর্ণ আলোয়, লছমন সিংহ দাঁড়িয়ে দুলনকে দেখে। দুলন চিৎকার করে ওঠে, আমরা আবহে শুনতে পাই অনেক কাকের কর্কষ ডাক। দৃশ্যটি শেষ হয়। বিহারের রূক্ষ জমিতে কোদালের আওয়াজের সঙ্গে কাকের ডাক মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। .... দুলন পুত্রবধুকে অস্ফট ভাবে কাছে ডাকে, পুত্রবধু কাছে আসে। দুলন তার ঘাড়ের গামছাটা নিয়ে হঠাৎই কপালের সিঁদুরের টিপটি মুছে দেয়। পুত্রবধু চিৎকার করে ওঠে 'মাইয়া' বলে। দৃশ্যটি শেষ হয়। গোটা নাটকে এই রকম হীরকখন্ড হরিমাধব বাবু নির্মাণ করেছেন। পরিমিত আলোর ব্যবহার দর্শককে মুগ্ধ করে দেয়''[৫০]।

'অনিকেত' নাটকটিতে দেখা যায়- ''নাটকটি শুরু হয় চায়ের টেবিলে পরিবারের সবাই উজ্জ্বল পুরনো স্মৃতিতে মসগুল। ছেলে মেয়েরা দেবকার কিছু ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে, যেন সুখি পরিবারের একটি ফ্রেমবন্দী ছবি। যত নাটক এগোয় দৃশ্যের পর দৃশ্যে ঐ ঘরটির মধ্যে একটি দমবন্ধ পরিবেশের আবহ সৃষ্টি হয়। সন্দেহ, অবিশ্বাস, ইত্যাদি মনোরমা এবং দেবুর সম্পর্কের উপর চেপে বসে। দেবু চলে যাবার পর একরাশ বেদনায় ভরাক্রান্ত হয় দর্শক। মঞ্চ পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হয়েছিল দুধারের দুটি জানালা যেন একমাত্র আলোর পথ। চরিত্ররা কখনো কখনো সেই জানালায় দাঁড়িয়ে দমবন্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। আলোর পরিকল্পনা অসম্ভব ভালো হয়েছিল। যে উজ্জল আলোয় এ নাটক শুরু হয় সেই উজ্জ্বল আলো নাটকের আর কোথাও থাকে না। গোটা মঞ্চজুড়ে আলো আঁধারীর সহবস্থান নাটকটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে''[৫১]।

পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় আমন্ত্রিত পরিচালক হিসেবে কলকাতার 'রঙ্গপট' নাট্যসংস্থায় 'আওরঙ্গজেব' নাটকটি পরিচালনা করেন এবং অভিনয়ও করেন। সাজাহান চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন।

১৯৭২ সালে সিমলাতে ১০ দিনের কর্মশালায় মহারাষ্ট্র, দিল্লী, পাঞ্জাব, কেরলের নাটক পরিচালকদের সঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সুযোগ পান। সেই ১৯৭২ এর উৎসব সফল হয়, কাগজে, পত্র-পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পায়। রাতারাতি পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটারের ভূগোলে ত্রিতীর্থ স্থান করে নিয়েছিল।

অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ঃ

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় শৈশব থেকেই নাটক দেখতেন। তিনি খুব ছোট বয়স থেকেই নাট্যমন্দিরে নাটক দেখতেন, অভিনয়ের মহড়া দেখতেন। পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠকালে 'টিপুসুলতান' নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয়। 'তরুণতীর্থ' (১৯৫২-১৯৫৩) প্রতিষ্ঠার পর তরুণতীর্থের সমস্ত নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। নাট্যমন্দিরে তাঁর পরিচালিত 'অমৃত অতীত', 'লৌহপ্রাচীর' ও 'চারপ্রহর' নাটকে অভিনয় করেন। 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯) প্রযোজিত প্রায় সমস্ত নাটকেই তিনি অভিনয় করেছেন। অভিনেতা হিসেবে তিনি যেমন 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'তে নজর করেন তেমনি 'তিন বিজ্ঞানী'(নিউটন), 'দেবীগর্জন' (প্রভঞ্জন সর্দার), 'শিশুপাল'(শিশু পাল) 'মঙ্গল চরণের বিবাহ', 'বন্দীসম্রাট'(চানক্য), 'চিরকুমার সভা'

(অক্ষয়), 'মাতৃতান্ত্রিক'(ভবতোষ), 'করকুহক' (মেজর বসাক) নাটকে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন।

১৯৭৮ সালের 'ত্রিতীর্থ'ই প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চে 'গ্যালিলেও' অভিনয় করেন। অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ব্রেখট এর এই নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। পৃথিবী বিখ্যাত এই বিজ্ঞানীর একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধনার, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর পরম আকাঙ্খা আবিস্কারের নেশায় বুদ হয়ে থাকা চার্চ কর্তৃপক্ষের তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা গ্যালিলিওর দ্বিধা দ্বন্দ্ব-এ সবই সুচারু রূপে তাঁর চরিত্রাভিনয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে। ''হরিমাধব মুখোপাধ্যায় চরিত্রে একজন বিজ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন বিজ্ঞানীকে আমরা মঞ্চে চাক্ষস করি। তাঁর দ্বিধা, তাঁর যন্ত্রণা, সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা চার্চ কর্তৃপক্ষের প্রতি তাঁর হতাশা এসব মঞ্চে অসম্ভব নিপুণতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কখনো নির্বাক হাতের ইশারা কখনো চুপ করে বসে সার্তির সাঙ্গে কথোপকথনে অসম্ভব একজন দায়িত্ববান গৃহকর্তা যার একমাত্র কন্যাই তাঁর অবলম্বন- এ সবই মঞ্চে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নিজস্ব অভিনয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ..... গ্যালিলিওর চিন্তায় সাগ্রেডো অস্থির হয় কিন্তু গ্যালিলিওর ভূমিকা অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায় মাথার উপর হাত রেখে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে বুঝিয়ে দেন। 'সত্যসত্যই আমি যা বলছি সেই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় আমার নেই।' এই সুন্দর দৃশ্যে সাগ্রেডো যতটা চিন্তিত মনে হয় ঠিক ততটাই নির্লিপ্ত থাকেন গ্যালিলিও- এক কথাই অপূর্ব ব্যঞ্জনা জাগায়''[৫২]।

'জল' নাটকে গভীর মমতায় অথচ দূরত্ব দিয়ে মঘাই ডোমের চরিত্রটি গড়ে তোলেন নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, চরসা নদীর সঙ্গে তাঁর একাকী কথা বলার মুহূর্ত বা জলের উৎস সন্ধানে তাঁর যাত্রাদৃশ্য পরিকল্পনার অনবদ্য। ''মঘাইডোম চরিত্রে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য রূপসজ্জা ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণ অভিনয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বঞ্চনার জ্বালা আর সংস্কারবাদী মনের সনাতন বিশ্বাস তাঁর মূক অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পেয়ে চরিত্রটি আশ্চর্য দ্বন্দ্বমুখর হয়ে উঠেছে।''[৫৩]।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্প অবলম্বনে লেখা 'বিছন' হিন্দি নাটকে ''হরিমাধব মুখোপাধ্যায় লছমনকে ভয়ঙ্কর করেছেন সংযমী থেকেই। অনেক না বলা কথা ছিল ওর অভিব্যক্তিতে''[৫৪]।

'অনিকেত' নাটকে দেবু চরিত্রে অভিনয় তাঁর অভিনীত নানা চরিত্র গুলির মধ্যে একটি ব্যতিক্রমি চরিত্র। চিত্র শিল্পী দেবু দায়িত্ব পরায়ন, পরিবারের অন্যদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত। সবচেয়ে বড় কথা মনোরমার বন্ধু দেবু এই চরিত্রটিতে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় দর্শককে চমৎকৃত করেছিলেন। ''তাঁর চলনে বলনে, বিশেষ কিছু ভঙ্গিমায়, প্রাণখোলা হাসিতে বাঙময় হয়ে উঠেছে দেবু। শেষ দৃশ্যে প্রায় পাঁচ মিনিটের নির্বাক অভিনয়ে দেবুর ব্যথা, বেদনা, স্মৃতির অব্যক্ত যন্ত্রণা, তাঁর নিরাসক্ত ভাবে সব কিছু মেনে নেওয়া বাংলা রঙ্গমঞ্চে দুর্লভ''[৫৫]।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বহু গুণীজনের সঙ্গে অভিনয় করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অশোক মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, মনোজ মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রীতা

দত্ত চক্রবর্তী, দেবশঙ্কর হালদার, বিজয়লক্ষ্মী বর্মন, ছন্দা চ্যাটার্জী প্রমুখ। তিনি সিরিয়ালও অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত সিরিয়াল হল 'এক শূণ্য শূণ্য', 'বহ্নিশিক্ষা', 'তমশারেখা'। তিনি সমর দত্ত পরিচালিত 'গান্ধর্বী' ছবিতে তাপস পালের বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

কলকাতার ২০০৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর 'রঙ্গপট' নাট্যসংস্থার আমন্ত্রিত পরিচালক হিসেবে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'আওরঙ্গজেব' নাটকটি পরিচালনা ও অভিনয় করেন। সাজাহান চরিত্রে তিনি অভিনয় করে দর্শককুলের দৃষ্টি করেছেন। ভারত সম্রাট সাজাহান এক জন ব্যর্থ পিতা যিনি তাঁর চোখের সামনে মোঘল সাম্রাজের পতনের সাক্ষী। ক্ষমতার লোভ উচ্চাশা - এই সব একটু একটু করে গ্রাস করেছে মোঘল সাম্রাজ্যকে। সাজাহান একাকি বন্দি অবস্থায় দ্বগ্ধ হচ্ছেন, ক্রোধী হচ্ছেন আবার কখনো সাধারণ মানুষের মত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সাক্ষাৎ পার্থী হতে পত্র দিচ্ছেন। বর্ণময় এই চত্রিটি অসাধারণ দক্ষতায় মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন অভিনেতা নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।

নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়:

ছোট শিশু হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্য জীবন শুরু হয়েছিল নাট্যমন্দিরের নাটকের মহড়া ও অভিনয় দেখে। এরপর শৈশবেই তরুণতীর্থ প্রতিষ্ঠা এবং এই নাট্যসংস্থার সমস্ত নাটকের পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন। ক্রমান্বয়ে 'নাট্যমন্দিরে' পাঁচটি নাটকের পরিচালনা। 'ত্রিতীর্থ' প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত নাটক পরিচালনা করে চলেছেন। কিন্তু নাটক লেখা সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু ভাবেননি। ''আমি কোনোদিন নাটক লিখব এটা ভাবিনি। আমার ভাবনার মধ্যেই ছিলনা, কিন্তু নাটকের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল, কেননা খুব ছোটবেলা থেকেই আমি নাটক করতাম অথচ নাটক লেখাটা আমার দ্বারা হবে এমনটা কখনো ভাবিনি।''[৫৬] ১৯৫৭-১৯৫৮ সাল নাগাদ তিনি যখন বি.এ. থার্ড-ইয়ারে পড়েন তখন অগাথা ক্রিস্টির একটা নভেল 'টেন লিটিল নিগারস' অবলম্বনে তিনি 'দশপুতুল' নামে একটি নাটক লেখেন যদিও নাটকটি এখনও পর্যন্ত অভিনয় হয়নি। 'দশপুতুল' নাটকটি পূর্ণাঙ্গ ছিল। প্রথম নাটক 'দশ পুতুল' নাটক লেখার পর ১৯৫৮-৫৯ সালে চেক্‌ভ এর গল্প 'ডেথ অফ আ ক্লার্ক' অবলম্বনে লেখেন 'বহ্নারম্ভ' নামে পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'বহ্নারম্ভ' নাটকটি পরবর্তীতে অভিনয় কালে 'হাইপারবোল' নামকরণ করেন।

১৯৬৯ সালে 'ত্রিতীর্থ' নাট্যদল গড়ে তোলেন। এখানে তিনি মূলত প্রথম দুই এক বছর তিনি কলকাতার অভিনীত হওয়া নাটক গুলিরই অভিনয় করতেন। '' এক-দেড় বছরে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম This is the not way ... বিদেশীহোক দেশী হোক এটাও তো কলকাতার অনুকরণ ছিল- অনুকরণ মানে কলকাতায় যা হচ্ছিল, এখানেও তা হচ্ছিল-'শের আফগান' নান্দীকারের নাটক, 'পুতুলখেলা' বহুরূপীর নাটক, 'নাট্যকারের সন্ধানে' নান্দীকারের নাটক ফলে এই যে কলকাতা মুখীনতা- এটা ঠিক হচ্ছেনা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ফলে within one or two year আমরা Start করি নিজেদের লোক দিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা করা, নিজেদের লোক দিয়ে নাটক লেখার।''[৫৭]

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল ''আমাদের নিজস্ব নাটক না হলে কোনো

আইডেন্‌টিটি তৈরি হবে না, এমনকি কোনো প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাবে না। তাই কলকাতার নাটক এখানে করার কোনো মানে হয় না।''[৫৮] কিন্তু নাটক লিখবেন কে? হরিমাধব মুখোপাধ্যায় লেখক নির্মলেন্দু তালুকদার, শুভ্রাংশু মৈত্রকে অনুরোধ করে নাটক লেখাতেন। সেই নাটক গুলির এডিট করতেন তিনি। এডিট করতে করতে নাটক গুলি নতুন রূপ পেয়ে যেত। তিনি স্বয়ং বলেছেন ''আমি জীবনে কোনোদিন নাটক লিখিনি। ওভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে লিখলাম- 'হাইপারবোল'। এরপর আর নাটক লেখার চেষ্টা করিনি। আমি নাটকের প্রয়োজনে, যখন কেউ ধরো নাটক লিখেদিচ্ছেন বা দলের হয়ে কেউ লিখে দিচ্ছেন সেটাকে এডিট করতে করতে, সংযোজন করতে করতে, কাটতে কাটতে, জুড়তে- এই রকম করতে করতে- আমি সে সময়- এটা অবিশ্বাস্য লাগবে যে আমি রাত্রি একটা/দু'টা পর্যন্ত পড়াশোনা করতাম। কারণ আমি যখন কলকাতায় - মানে এখানে (বালুরঘাট) কেউ নেই যাঁরা এদের অভিনয় দেখেছেন- তৃপ্তি মিত্র, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, উত্তম কুমার, বসন্ত চৌধুরী, মলিনা দেবী, কত কত কত নাম শুনবে তুমি। এঁদের প্রত্যেকের অভিনয় আমার দেখা। বিকাশ রায়-এর অভিনয় আমার দেখা- স্টেজের অ্যাকটিন। তা এই সব দেখে দেখে আমার একটা দিশা তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে একেবারে গন্ডমুর্খ, সুতরাং এসব জানতে হবে, শিখতে হবে- এই গুলির চেষ্টা চলছিল।''[৫৯]

তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজেকে শক্তিশালী করতে থাকেন। তখনও কলকাতার জনপ্রিয় নাটকগুলি অভিনয় হত। ''মাসে হয়তো কলকাতার জনপ্রিয় নাটক করেছি এক-আধটা কিন্তু মোস্টলি নতুন নাটক খুঁজেছি। হয় নিজে লিখেছি বা নাট্যরূপ দিয়েছি, বা কাউকে ইন্সপায়ার করেছি নাটক লিখতে- এরকমই বেশির ভাগ। এই যেমন অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' গল্পটা নাট্যরূপ দিয়ে ও অভিনয় করে আমরা হাতে নাতেই প্রমাণ পেলাম যে এটাই আমাদের নিজেদের নাটক। নিজেদের মতো নাটক না করতে পারলে ওই পরের চাটা এঁটো ঘেটে লাভ নেই।''[৬০]

এই সমস্ত চিন্তাভাবনা করতে করতে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন নাটককারদের নাটক পড়তে লাগলেন। ''সেই সময় আমি ছাত্রের মতো রেগুলার প্রচুর নাটক পড়তাম। নাটক লেখার টেক্‌নিকটা কী, কেমন হয় এটা বোঝার জন্য শেক্সপিয়র থেকে শুরু করে সার্ত্রে, কামু, ভয়েস্কার, বানর্ডশ এদের নাটক সমানে পড়তে থাকলাম। পড়তে পড়তে একটা সময় মনে হল যে, বোধহয় আমিও নাটক লিখতে পারি''[৬১]। এই ভাবে তিনি এক সময় নাটককার হয়ে উঠলেন। তাঁর নাটক রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নাটকের কথাবস্তু অনুসারে তিনি নাটকের স্থান (পটভূমি) ও ভাষা নির্বাচন করেছেন। বাংলা ভাষার উপভাষা গুলি তিনি সযত্নে আয়ত্ব করেছেন। আবার হিন্দি ভাষা তিনি আয়ত্ব করেছেন। নাটকগুলিতে রয়েছে লোকায়ত গ্রামীন জীবন এবং তাদের ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতির নানা উপাদান তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন ''শুধু আঞ্চলিক ভাষা নয়, এখানকার যে ট্রাডিশনগুলো রেয়েছে, যে মিথ গুলো রয়েছে যে রিচ্যুয়ালস্ রয়েছে। যে লোকজ গানগুলো রয়েছে, সে গুলোকে কীভাবে প্রয়োগ করা যায়।''[৬২] তিনি তাঁর নাটকগুলিতে তার সুষ্ঠ প্রয়োগ করেছেন। শিলিগুড়ির 'দামামা নাট্যগোষ্ঠী'র নির্দেশক ও অভিনেতা পার্থ চৌধুরীর মতে ''গ্রামীন সংস্কৃতি নিয়ে নাটক লেখার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে মাধবদার তুলনা নেই।''[৬৩] ১৯৭৪ সাল থেকে তিনি

প্রায় ৪০টি নাটক রচনা করেছেন। ১৯৭৪ সালের পূর্বে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করতে করতে ১৯৫৭-৫৯ সালের মধ্যে দুটি নাটক লিখেছিলেন (দশ পুতুল ও বহ্বারম্ভ)। দুটি নাটকই পূর্ণাঙ্গ। যদিও নাটক দুটি কখনো অভিনয় হয়নি। '' এ-দুটো সযত্নে এবং গোপনে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম।''[৬৪] তাঁর লেখা নাটকগুলি চরিত্রবহুল, তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলিও চরিত্র বহুল, বহু চরিত্র নিয়ে কাজ করা তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য। ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি মোট ২৭টি নাটক লিখেছেন। এই ২৭টি নাটকের নাম ও সময় উল্লেখ করা হল। ২৬টি নাটকের সরস আলোচনার জন্য বিস্তৃত পরিধির প্রয়োজন। তাই বিশেষ জনপ্রিয় নাটক গুলির সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

মৌলিক নাটকঃ

শিশুপাল (১৯৭৪) ঃ নির্মলেন্দু তালুকদার ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায় যৌথ ভাবে।
অন্তর্ধান (১৯৯৭)
খারিজ (১৯৯৭)
পত্রশুদ্ধি (১৯৯৯)
সন্ন্যস্ত (২০০০)
গোধুলী বেলায় (২০০০) ঃ স্বল্প দৈর্ঘ্যের
প্রপন্ন্যা (২০০০)
অসমাপিকা (২০০৩)
লুকোচুরি(২০০৪)

একাঙ্ক নাটকঃ

তখন সূর্য ওঠে-১৯৫৯
হাজার স্বপন(১৯৮৩)
বোধদয় (১৯৯৩)
উপলব্ধি (১৯৯৫)
অন্যমনস্কচোর(২০০০)
বন্দুক (২০০০)
যদি এমন হতো২০০৭)

অনুপ্রাণিত নাটকঃ

দশপুতুল (১৯৫৮) ঃ আগাথা ক্রিষ্টির 'টেন লিটিল নিগারস' অবলম্বনে।
বহ্বারম্ভ (১৯৫৯) ঃ চেখভ এর 'ডেথ অফ আ ক্লার্ক' অবলম্বনে বহুরম্ভ লেখেন। অভিনয় কালে নাটকটির নাম করণ করা হয় 'হাইপারবোল'।
জল (১৯৮০) ঃ মহাশ্বেতা দেবী ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।
দেবাংশী (১৯৮৩) ঃ অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প 'দেবাংশী' অবলম্বনে।
বিছন (১৯৮৫) ঃ মহাশ্বেতা দেবীর বিছন গল্প অবলম্বনে।
ঠাকুরদা -১৯৯০ ঃ রবীন্দ্র ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে (হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু তালুকদার) একাঙ্ক নাটক।

বিপুলৌষধি(১৯৯১) ঃ পরশুরামের গল্প অবলম্বনে।
পণন (১৯৯৬) ঃ দুলেন্দ্র ভৌমিক এর 'সওদা' গল্প অবলম্বনে।
মাতৃতান্ত্রিক(২০০০) ঃ সামার সেটমম এর কাহিনী অবলম্বনে।
করকুহক (২০০৬) ঃ জেকবের 'monkey's paw'

বেতার নাটকঃ
পঁচিশ পঁচাত্তর (১৯৭৮)

শিশুপাল (১৯৭৪)ঃ

শিশুপাল নাটকটি নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু তালুকদারের যৌথ উদ্যোগে লেখা। নাটকটি প্রথমে নির্মলেন্দু তালুকদার লেখেন, পরে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সংযোজন, পরিমার্জন করেছেন। অপেরাধর্মী এই নাটকে পশ্চিম বাংলার সাতের দশক সময়কে ধরা হয়েছে। যখন নাগরিক জীবনে দৈনন্দিন শংকা, অনিশ্চত জীবন এবং জিনিস পত্রের আকাশ ছোয়া দাম দুর্বিসহ করে তুলেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা মানুষকে ক্লান্ত করে তুলেছে। এই সময়টাকে নিয়ে নাটককার ব্যঙ্গাত্মক এবং হাস্যরসাত্মক কতকগুলি কোলাজ তৈরি করেছেন। বোমাবাজি, আকাশ ছোয়া বাজার দর, দৈনন্দিন শঙ্কাকে তিনি মঞ্চে এনেছেন কতকগুলি টুকরো দৃশ্যের মাধ্যমে। প্রতি দৃশ্যে প্রচুর গান, খোল-করতাল সহযোগে চলিত কীর্তনের সুর পরবর্তী দৃশ্যকে মনোগ্রাহী করে তোলে। শেষে অসহায় মানুষ দেবতার স্মরণ নেয়। শেষ দৃশ্যে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ জানায়। শ্রীকৃষ্ণ সাতের দশকের চিরপরিচিত বেলবটস্ প্যান্ট পরে ঘুম থেকে উঠে মঞ্চে আসে- এই দৃশ্যটি খুবই মজাদার। অবশেষে দেখা যায় স্বার্থান্বেষী এবং কায়েমী স্বার্থের কাছে সে নিজেকে সমর্পণ ক'রে সে পুজো পায়। মহাভারতের শিশুপাল কাহিনির প্রেক্ষাপটে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ ছিল নাটককার ও পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মূখ্য উদ্দেশ্য।

১৯৯৫ সালের বন্যায় 'ত্রিতীর্থ' প্রেক্ষাগৃহে জল ঢুকে যাওয়াই বহু মূল্যবান বই ও তথ্যের সঙ্গে এই নাটকটি সম্পুর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম অভিনয়- ১৯৭৪ সালে ১৮ই মে ত্রিতীর্থের প্রযোজনায় কল্যান মঞ্চে অভিনীত হয়।

জলঃ (১৯৮০)

১৯৭৯ সালে কৃত্তিবাস পত্রিকায় প্রকাশিত মহাশ্বেতা দেবীর 'জল' গল্পটি পড়ে নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের গল্পটির বিষয় নিয়ে নাটক করার ইচ্ছা হয়। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু ড. অশোক দত্ত তাঁকে বলেছিল ''যদি ক্ষ্যামতা থাকে এই নাটকটা কর। তুই চ্যালেন্স দিলি, হ্যাঁ চ্যালেন্স দিলাম। বললাম ঠিক আছে''[৬৫]। কিন্তু নাট্যরূপ কে দেবেন? তখন পর্যন্ত মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের কোনো পরিচয় হয়নি। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় করিয়ে দেন। মহাশ্বেতা দেবীর 'জল' গল্পটি নিয়ে নাটক করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহাশ্বেতা দেবী

নাটকটির নাট্যরূপ দিতে স্বীকৃত হন। ''মহাশ্বেতাদির খুব স্টেটকাট ভাষা।Out spoken মহিলা তিনি বললেন 'দেখ আমি তো নাটক লিখিনা, আমি এই সব উপন্যাস-টুপন্যাস লিখি, ন্যাচারলি নাটক কি করতে পারবো জানিনা। তবে এতদিনের (?) মধ্যে তুমি একটা পাঠাবে, আমি একটা পাঠাবো'। সময়মত আমার কাছে স্ক্রিপটা এসে পৌছাল। Practicaly one act মত হয়ে গেছে। বিশাল, স্পেস-ট্যান কিছু নেই। আমি একটা দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। ..... উনি আমার একটা চিঠি লিখলেন 'throw away my script into the dustbin and right it your self' and then I started writting এবং আমরা সেটা করলাম। তিনি আসলেন দেখলেন দেখে অসম্ভব খুশি হলেন।''[৬৬]

কাহিনীঃ

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির পর তিনটি দশক পার হয়ে গিয়েছে ভারতে। স্বাধীনতার সেই দিনটি থেকে সর্বপ্রকার শোষণমুক্তির বানী ঘোষণা করে উচ্চগ্রামে ঢাক বাজাচ্ছেন রাষ্ট্রনায়কেরা। এস্ট্যাব্লিশমেন্ট যখন শৌখিন সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর তখন এদেশেরই অসংখ্য গ্রামে গঞ্জে শ্রেণী ও জাতি বৈষম্যের অন্ধকার ঘন হয়ে ছেয়ে আছে। পুরুলিয়া জেলার চরসা নদীর তীরে এমন একটি গ্রাম, নদীর নামেই তার নাম। অধিবাসীদের মুষ্টিমেয় কিছু বর্ণহিন্দু, অধিকাংশই হরিজন। পুরুলিয়ার প্রচন্ড খরায় নদী মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায়। তার সাথে শুকায় হরিজনদের বুক। সরকারী সাহায্য আসলেও তার বেশির ভাগ আত্মসাৎ করে সন্তোষ পূজারী, গ্রামের মাতব্বর। বৃদ্ধ মঘাই ডোমের মধ্যে রয়েছে অবিশ্বাস্য ক্ষমতা। তিনি উত্তাধিকার সূত্রে পেয়েছে এই ক্ষমতা। তিনি বলতে পারেন পাথুরে মাটির নীচে জলের গোপন উৎস। সন্তোষ পূজারী সরকারী টাকায় কুয়ো খোঁড়ে। কিন্তু সেই জল স্পর্শ করার অধিকার নেই হরিজনদের, এমন কি মঘাই বা তার পরিবারেরও না।

১৯৭১ এর নক্শাল আন্দোলনের ঢেউ চরসার বুকে এসে লাগে। নক্শালীদের আদর্শে এবং আত্মদানে নতুন প্রেরণা আসে মঘাই এর ছেলে ধুরার, সংশয় জাগে মঘাই-এর নিজেরও। জীতেন মাষ্টার আসে চরসা গ্রামে। তিনি বিয়াল্লিশের আন্দোলনের একজন শরিক। তিনি এই অসাম্যের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়ান। জীতেন মাষ্টার, সন্তোষ পূজারী, বর্ণহিন্দু এবং এস.ডি.ও. এর ভ্রুকুটি এবং কড়া সতর্ক উপেক্ষা করে হরিজনদের জাগিয়ে তোলে এই অন্যায়ের বিরূদ্ধে। অবশেষে তাঁর নেতৃত্বে বর্ষার নদীর জলকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখে সারা বছরের সঞ্চয় হিসেবে। এর ফলে সন্তোষ পূজারীর রিলিফ ব্যবসা, বর্ণহিন্দুদের শ্রেণী আধিপত্য বিপন্ন হয়। এস.ডি.ও. এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান। সুতরাং বহু শ্রম ও আশা আকাঙ্খার বাঁধ ভেঙ্গে দিল সন্তোষ পূজারীর দল-পুলিশ, এস.ডি.ও.। পুলিশের গুলিতে আহত বৃদ্ধ মঘাই তাঁর প্রাণহীন দেহ ভেসে গেল জাত্যাভিমান এবং শোষণের বানে।

প্রকৃতিঃ পূর্ণাঙ্গ

প্রথম অঙ্কে- ১২ দৃশ্য
দ্বিতীয় অঙ্কে-১৩ দৃশ্য

ভাষাঃ পুরুলিয়ার উপভাষা ব্যবহার করে চরিত্রদের জীবন্ত করে তুলেছেন।

চরিত্রঃ ১৭জন চরিত্র। এছাড়া কয়েকজন পুলিশ, কিছু বর্ণহিন্দু, রয়েছে গ্রামের বহু ছেলে ও মেয়ে।

সংলাপঃ প্রথম অঙ্কের দ্বাদশ দৃশ্যে দেখা যায় চরসা গ্রামবাসীদের জটলা। সকলে সন্তোষ পূজারীর উপর রুষ্ট হয়ে আছে। সরকারী রিলিফ, কুয়ার জল কোনো কিছুতে হরিজনদের অধিকার না থাকায় তারা মারমুখি হয়ে উঠেছে।

সন্তোষঃ আরে ইকি তোরা যে সভে এসছিস্? কি কুথারে? পূজা আছে নাকি?

মঘাইঃ না সন্তোষ বাবু।

সন্তোষঃ মঘাই তুমু?

মঘাইঃ হা সন্তোষ বাবু আমু।

সন্তোষঃ বুল্য।

মঘাইঃ কুথা একটাই সন্তোষ বাবু। খরার কোলে জনম, কোলে মরণ। কিন্তু ই সনে খরা দুরান্ত। (গ্রামবাসীর দিকে চায়)

সকলেঃ এমুন খরা দেখি নাই।

সন্তোষঃ তুরাদের ধরম করম গিঞাছে-খরা হবেক নাই? আমার পূজায় তুরা বেগার দিস্ জনম্ ভর, গত সনে দিয়াছিলি?

মঘাইঃ বেগার কে দিব্যে সন্তোষবাবু? কুথাকে নক্শালী পাতুলে মল্য, তুমু চরসায় পুলুশ নামায়ে দিলা। মরদরা পলায়ে বাঁচে-বেগার দিব্যে কে?

সন্তোষঃ আমু পুলুশ নামালাম্?

ধুরাঃ পুলুশ তভে তুমার নাম বলল্য কেনী?

সন্তোষঃ মিছা কথা।

মঘাইঃ না সন্তোষবাবু ধুরা মিছা জানে না। ডোম, চাঁড়াল, কেত্তা, তিওড় মিছা জানে না সন্তোষ বাবু-মিছা জানে না। মিছা বুল্যে না।

গানঃ নাচে গানে পূর্ণ নাটকটিতে মোট ৯টি গান রয়েছে।

প্রথম অঙ্কঃ

দ্বিতীয় দৃশ্যে ১টি গান -'অ মোর সনা সনারে'
পঞ্চম দৃশ্যে ১টি গান -'হা মা পাতাল গঙ্গা'
নবম দৃশ্যে ২টি গান - ১. 'দে জল দে জল'
২.'অ মোর কিষ্ট সোনা'
দ্বাদশ দৃশ্যে ১টি গান - 'দে জল দে জল' এর পুনাবৃত্তি।

দ্বিতীয় অঙ্কঃ

ষষ্ঠ দৃশ্যে ২টি গান - ১. 'তুমু মোর মা জননী'
-২.'চরসা সুখা চরসা রুখা'
একাদশ দৃশ্যে১টি গান -'পদ্মফুলের মালা দিব'
ত্রয়োদশ দৃশ্যে ১টি গান -'আহা শঙ্কিনী লাগেতে মায়ের ....'

প্রথম অভিনয়ঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০, ত্রিতীর্থ গোবিন্দ অঙ্গন (কল্যান মঞ্চ)
মহাশ্বেতা দেবীর একমাত্র নাটক 'জল'। 'জল' গল্পটির নাট্যরূপ দিতে অনুরোধ করেছিলেন

নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। মহাশ্বেতাদেবীর নাটক লিখেদিয়েছিলেন। নাটকটিতে আরো কিছু বিষয় সংযোজন করলে ভালো হয় বলে মনে করেছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। '' এই গল্পের যে Panoramic পটভূমি এবং মঘাই ও অন্ত্যজদের জীবন যাত্রা-মঘাই-র Mythical power to divine water এবং Administration-র অকারণ অনৈতিক নিষ্ঠুরতা এবং সমস্ত অন্ত্যজ মানুষের বাঁধ তৈরির চেষ্টা মঘাইয়ের আত্মবলিদান-পুলিশি অত্যাচার-এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আপনার নাট্যরূপে ধরা পড়েনি, অথচ আমার বিবেচনায় 'জল' নাটকের সার্থকতায় এই সব বিষয়গুলো নাটকে যথাযথ Reflected হওয়া দরকার''[৬৭]

নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ত্রিতীর্থের প্রযোজনায় কল্যান মঞ্চে ২৪.০২.১৯৮০ প্রথম অভিনয় হয়। মহাশ্বেতাদেবী বালুরঘাটে এসে ত্রিতীর্থের কল্যান মঞ্চে বসে অভিনয় দেখেছিলেন। 'জল' নাট্য প্রযোজনা প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছিলেন '' 'জল' নাটক অভিনয়ে ও প্রযোজনায় একেবারেই আমার গল্পের সঙ্গে সকল যথার্তে একাত্ম। 'ত্রিতীর্থ' সংস্থার সঙ্গে এই যোগাযোগে আমার কাছে যা খুব দ্যোতক। আমি এঁদের সঙ্গে Creatively united থাকতে অনুপ্রাণিত বোধ করছি। এঁরা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। সঠিক ও মূল্যাশ্রায়ী নাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব এঁরাই করতে পারেন। সে বিশ্বাস আমার হয়েছে। যে নাট্য আন্দোলনের আরেক নাম সংগ্রাম''[৬৮]।

দেবাংশী (১৯৮৩)ঃ অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' গল্পটির নাট্যরূপ দেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। 'দেবাংশী' নাটক রচনার প্রসঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ''অভিজিৎ সেন 'দেবাংশী' নামে একটা গল্প লেখে। এক বৃষ্টি ঝরা শ্রাবণ সন্ধ্যায় অভিজিৎ এর বাসাবাড়িতে গল্পটা আমাকে পড়ে শোনায়। আমি শুনে অভিভূত এবং প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। আমি বলি-'জামাই (ওকে আমি জামাই বলতাম, ও আমাকে প্রভু বলত) এই গল্পটা নিয়ে আমি নাটক করব।' আমি ভাবতে থাকি কিভাবে নাটকটা লিখব? কেননা, গল্পটা শুনে আমার বারবার এটা মনে হতে থাকে যে, শুধু আঞ্চলিক ভাষা নয় এখানকার যে ট্রাডিশন গুলো আছে, যে মিথগুলো আছে, যে রিচ্যুয়ালস্ আছে, এমনকি যে লোকগানগুলো আছে-সেগুলোকে নাটকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়। এইসব ভাবতে ভাবতে অনেকদিন কেটে যায়, ওদিকে অভিজিৎ অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। আসলে গল্পটা শুরু হয় ফ্ল্যাস ব্যাকে, কিন্তু নাটকে ওটা আনব কি ভাবে? স্টেজে দেখাবো কীভাবে? কেননা, স্টেজের কতগুলো লিমিটেশনস্ আছে, টাইম ফ্রেম আছে, পাল্টানো আছে, মেকাপ আছে- এসবই ভাবাচ্ছিল আমাকে অনেকদিন ধরে। এইসব জিজ্ঞাসা পেরিয়ে অবশেষে 'দেবাংশী' নাটকটা লিখি।''[৬৯]

কাহিনিঃ নাট্যকাহিনিটি গড়ে উঠেছে তথাকথিত পশ্চিম দিনাজপুর বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। এক শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে গ্রামের মানুষ যখন মেতে উঠেছে দেবী বিষহরির আরাধনায় তখন হঠাৎ বিরাম গুনমান দশ বছর বয়সী বালক সারবান লোহারের মধ্যে দেখতে পায় দেবতার ছায়া। এই নিয়ে সামসের গুনমানের সঙ্গে চলে তাঁর মন্ত্রের লড়াই। বিস্মিত গ্রামবাসীর চোখের সামনেই প্রমাণিত হয় বিরামের অনুমান সত্য। সারবান ছিল গ্রামের জোতদার মন্ডল মশাইয়ের গৃহভৃত্য। সরবানের মধ্যে দেবত্ব প্রকাশিত হলে সংস্কারাচ্ছন্ন মন্ডল মশাই ভীত হয়ে পড়েন। বিরামও এমন দেবতাকে ছেড়ে

দিল না। তাই সে মন্ডলের কাছ থেকে সারবান কে কিনে নিল মাত্র কুড়ি টাকায়। শুরু হল সারবানের ভিন্নতর জীবন যাত্রা। সে হল দেবাংশী। অর্থাৎ দেবতার অংশ। এই ঘটনাটি ঘটে নাটকের প্রথম দৃশ্যেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয় পঁয়তাল্লিশ বছর পরের ঘটনা নিয়ে। বিরাম বিগত হলেও তার গড়ে তোলা সংস্কারের সাম্রাজ্যে অপ্রতিহত শাসনে বসে আছে সারবান দেবাংশী। গবেষক সাংবাদিকদের সংলাপে জানা যায় দেবাংশীও বিশ্বাস করে মানুষের মধ্যে ঐশীশক্তির প্রকাশ সম্ভব। কিন্তু সারবান দেবাংশীর বিশ্বাসে সন্দেহের পোকা নিয়ে আসে সেতু বর্মন। দেবেন মন্ডল সেতু বর্মনের জমির দখল নিতে চায়। সেতু বর্মন বিচার চায় দেবাংশীর কাছে। সেতুর প্রার্থনায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে দেবাংশী। কারণ এতদিন দেবাংশী তুক্‌তাকের মধ্য দিয়ে সারিয়ে আসছিল নানা অসুখ বিসুখ, তার লড়াই ছিল অদৃশ্য কিছুর সঙ্গে। আজ প্রতাপশালী সামন্ত প্রভুর বিরূদ্ধে বিষহরির বিধান কতটা কার্যকরী হবে তাই তার নিজের মনের মধ্যে দেখা যায় সংশয়। অথচ দেবাংশী নীরবও থাকতে পারছে না। বিশেষ করে এই দেবেন মন্ডলের বাবার কাছেই জমি হারিয়েছিল সারবানের বাবা। দেবাংশী বিধান দেয় সেতুর সপক্ষ্যে ‘‘জমির দখল ছাড়বু না, মন্ডল উচ্ছেদ করবা চালে মা বিষহরির নামে বাধা দিবু। ই নে মায়ের থানের মাটি গলাত তাবিজ করে ঝুলাবু।’’ সেতু পক্ষে বিধান শুনে দেবেন মন্ডল শাসায় দেবাংশীকে। তার পরেই কাকতালীয় ভাবে দেবেন সাপের কামড়ে মারা যায়। দেবেনের মৃত্যুতে দেবাংশীর ঐশীক্ষমতা লোকে আরো বেশী বিশ্বাস করে কিন্তু গোলমাল বাঁধল দেবেনের ছোট ছেলে বিনোদকে নিয়ে। সে বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সেতুকে শাসায় ও দেবাংশীকে আঘাত করে। গায়ে লোক ভাবে বিনোদকে দেবীর অভিশাপ ভোগ করতে হবে। কিন্তু প্রত্যাশিত অভিশাপ কিছুতেই আসেনা। দেবাংশী বুঝতে পারে দেবতার ক্রোধ বিনোদকে কিছুই করতে পারে না। কেননা দেবতা মানুষের কখনো প্রতিশোধ নেয় না। অন্যায়ের প্রতিবিধান করার ক্ষমতা দেবতার নেই। তাই সেতু বর্মনের মেয়ে সুশীলা তার ইজ্জত হারানোর বিধান চাইতে আসলে সারবান বলে, ‘‘ই মানুষটা পাপী, মহাপাপী, ইখানে যারা বাপ আছেন, ভাই আছেন, স্বামীরা আছেন- আপন আপন বিটি, বুন, পরিবারের ইজ্জৎ বাঁচাবার দায় আপনাহরের যান পাপীকে সাজা দেন’’।

সারবানের এই কথা যেন দৈব আদেশ। মানুষের সমস্যা মেটাতে পারে একমাত্র মানুষ ও তার সংঘশক্তি, তাই সুশীলার শ্লীলতাহরণকারী বিনোদের উপর প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসে গ্রাম বাসীরাই। জাগ্রত জনশক্তির কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় বিনোদ।

নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় খুব সাফল্যের সঙ্গে দেশজ গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাটকের জন্য তিনি যে ভাবে গ্রহণ বর্জন করেছেন তা লক্ষ করার মত। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় গ্রামীন পটভূমি নাটক রচনা করলেও তিনি মজাদার করার জন্য গান, নৃত্য দিয়ে ভরাট করেন না। তাঁর নাটকে চরিত্র সংখ্যা অনেক কিন্তু সবটাই বাঁধা থাকে নাটকীয় সূত্রে যা আলগা করা খুবই শক্ত।

অভিজিৎ সেনর ‘দেবাংশী’ গল্পের সারবান লোহারকে লোভী হিসেবে দেখা যায়।

কিন্তু 'দেবাংশী' নাটকে সারবান লোহার মানুষের চাপে সংস্কারচ্ছন্ন হয়েছে কিন্তু লোভী নয়। লোভী হলে তার জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব গভীর হতে পারত না। নাটকে ধর্মান্ধতাকে ব্যঙ্গ করার জন্য তাকে আরো জোরদার করা হয়েছে। নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় কারও বিশ্বাসকে ছোট করেননি-ঘটনার আবর্তে চরিত্রেরা নিজের পথে চলে। খুব স্বাভাবিক ভাবে অমোঘ পরিণতি ঘনিয়ে আসে।

গল্পকার অভিজিৎ সেন দুই প্রতিপক্ষের নাম রেখেছেন সারবান লোহার ও দৈত্যারি মন্ডল। দুটিই অপ্রচলিত নাম। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সারবান নামটি রেখেছেন কিন্তু দৈত্যারি নাম বদলে রেখেছেন দেবেন মন্ডল। অর্থের দিকে না গিয়েও সারবান নামটি উচ্চারণে সুবিধা এবং দেবেন খুব পরিচিত নাম। দৈত্যারি হলে সকলের মুখে উচ্চারণ ছাড়াও অপরিচয়ের কুয়াশা জমত।

গল্পে আছে শ্রাবণের মাঝামাঝি একরাতে সুশীলা লুট হয়। পাঁচজন মানুষ মুখে গামছা ঢাকা দিয়ে সেতুর বাড়ি চড়াও হয়। দুটো বন্দুক ছিল। বন্দুকের শাসানীতে গ্রামের মানুষ এগোতে পারেন না। সেতু ও বিহানু ঠেকাতে গিয়ে জখম হয়। অন্ধকারের মধ্যে সুশীলাকে নিয়ে মাঠে নেমে যায় পাঁচজন মানুষ। কিন্তু নাটকে দেখা যায় সুশীলাকে লুট করে একজনই। ফলে ক্লাইম্যাক্স চরমে ওঠে। আবার গল্পের মত দৈত্যারি (দেবেন) যে ভাবে সারবানকে কাজে লাগাতে চায় সেটা একটু বিস্তারিত হলে নাটক ব্যাপকতা পেত।

প্রকৃতিঃ ১৭টি দৃশে নাটকের কাহিনী বিবৃত।

চরিত্রঃ ৩৮জন চরিত্র। এছাড়াও রয়েছে গ্রামবাসী (মহিলা ও পুরুষ)।

ভাষাঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের কথ্য ভাষায় ভাষা চরিত্রের মুখে বসানো হয়েছে।

সংলাপঃ ১১নং দৃশ্যে দেখা যায় সারবান ভীষণ চিন্তিত,পায়চারী করছে। সকলে যখন আইনী সংক্রান্ত বিষয় গুলি নিয়ে দেবাংশীর কাছে বিচার চায়। কিন্তু মানুষের হাতে গড়ে তোলা এই দেবাংশীর সেই বিধান দেওয়া সম্ভব নয়। দেবাংশী নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন তাই সে অস্থির হয়ে পড়েছে। স্ত্রী-মোক্ষদা সঙ্গে কথপোকথনে দেবাংশীর চাপিয়ে রাখা মানবসত্তার প্রকাশ ঘটেছে।

মোক্ষদাঃ দেবাংশী। অধজ্জ হন না দেবাংশী।

সারবানঃ তুই মোক দেবাংশী কয়া ডাকিস না কোকিলের মাও। ঐ নাম শুনে মোর ঘোর নাগে যায়। মোর বিচার বুদ্ধি বেবাক আউলে যায়। মুই ভুলে যাই মুই একটা মানুষ-দেবতা লয়-দেবতার অংশও নয়।

মোক্ষদাঃ এলা কি কছেন দেবাংশী।

সারবানঃ আ: দেবাংশী নয়। ক কোকিলের বাপ ক মোক্ষদা কতদিন তুই মোক কোকিলের বাপ কয়া ডাকিস না। ডাক মোক্ষদা, ডাক শুনে মোর জিও জুড়াক।

মোক্ষদাঃ না মুই পাইরম না, মোর পাপ হবে।

সারবানঃ হায়রে বেবুজ মিয়া মানুষ। তুইও বিশ্বাস করিস মুই দেবাংশী। আর

কেউ না তুই জানিস কোকিলের মাও ও- মোরই দেহটার ভিতর একটা মানুষ আছে-হু মানুষ-দেবতা নয়। সি মানুষটার ক্ষিদা আছে, রোগ-শোক, জরা আছে, রিপুর দহন আছে।

মোক্ষদাঃ এলা কথা কন না দেবাংশী। চুপ দ্যান, চুপ দ্যান।

সারবানঃ কেন চুপ দেম? কেন মোক্ষদা-কথাগুলান কি মিছা?

মোক্ষদাঃ সত্যি মিথ্যা জানিনা। সব মা বিষহরির লীলা।

সারবানঃ হ ঠিকই কছিস, সব মা বিষহরির লীলা। দেবেন মন্ডল সাপের কামরে মইরল, মানুষ বুঝে নিল মোর অভিশাপেই দেবেন মরিছে। রুহিনী মন্ডল প্রাণের ভয়ে জাফরক জমি ফিরা দিল, মানুষ ভাবল যা ইচ্ছা তাই কইরবা পারি। কিন্তুক মোক্ষদা কেউ বুঝবা চায় না মুই কিছুই করি নাই কিছু, কিছু করবাও পারি না।

গানঃ 'দেবাংশী'নাটকে গানের প্রয়োগ সম্পর্কে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বলেছেন ''আমি মনসামঙ্গলের দশ-বারোটা ভার্সান শুনে, ওর মধ্যেকার অনেক গান, গানের কলিগুলো ব্যবহার করে এক একটা গান তৈরি করি। এবং সেসব গান আমি কোনো ওস্তাদকে দিয়ে গাওয়াইনি, গাইয়েছি তাঁকে দিয়েই- হি ইজ্ জাস্ট' এ কাল্টিভেটর অ্যান্ড এ পাওয়ারফুল ভয়েস। আমিই তাঁকে খুঁজে বার করেছি, প্রত্যেকটা গান গাইয়ে তুলে তুলে টেপে রেকর্ড করেছি। গীতা সেন, মানে তাপস সেনের স্ত্রী গীতাদি ভালো লোক সংগীতের গবেষক সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি দেখে শুনে বললেন, আরে ভাই একে তুমি জোগার করলে কোথা থেকে? আমি ওই চাষি গাইয়েকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলাম। বললাম এই সেই ওস্তাদ..... সে কী আশ্চর্য তাঁর গলা, তাঁর গায়কি।''[৭০]

প্রথম দৃশ্যে ১টি গান- একখানি পুস্করণী চারিখানা ভাটা।
তাহাতে জন্মিল পদ্মমেরি পাতা।।

চতুর্থ দৃশ্যে ১টি মন্ত্র- উজ্জিল বসুমতি, উজ্জিল ধম্ম।
যাহাতে হইল বিষ বাণ জন্ম।।

প্রথম অভিনয়ঃ ১৩নভেম্বর ১৯৮৩, গোবিন্দ অঙ্গন, (কল্যান মঞ্চ)।

১৯৮২ সালের ২৩ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার জ্ঞানমঞ্চে, কলিকাতা সিগ্যাল এম্পায়ার ও ম্যাক্সমুলার ভবনের যৌথ আমন্ত্রণে 'ত্রিতীর্থ' প্রযোজনা করে 'দেবাংশী'। দেবাংশী অভিনয়ের পরে সারা পড়ে যায় কলকাতায়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা 'দেবাংশী'র নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে।

'দেবাংশী' নাটকের অভিনয় দেখে নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে তৃপ্তি মিত্র পত্রযোগে প্রশংসা করেন ''সেদিন দেবাংশী নাটকটি আমার খুবই ভাল লেগেছিল। প্রযোজনা পরিচালনা অভিনব সব। যিনি দেবাংশীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাঁর কথা কি বলব ; অতি সুন্দর। তুমি নিজেও খুবই ভাল। সকলেই ভাল। আর এই সকলেই যখন নিবিষ্ট হয়ে অভিনয় করে তখনই না নাটক জমে ওঠে''[৭১]।

আজকাল পত্রিকায় শোনা গেল '' 'দেবাংশী' নাটকের দেবাংশী কিন্তু নিজে জানে সে মানুষের হাতে বানানো, এই দেবত্ব অলীক স্বর্গের, এইখানেই আধুনিকত্ব। বিচিত্র টানাপোড়েনের যন্ত্রণা-তার গল্পে ঘিরে ধরে নানা রকম গ্রামীন সমস্যা। যে সমস্যার জাল দেবাংশীকে প্রায় গ্রাস করে।..... হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রেখটের মত আবেগ বর্জন করা। শেষ দৃশ্যে শ্রাবণ সংক্রান্তি সত্বেও কোনো বাজের ডাক শোনা যায়নি। আলো রং পরিবর্তন হয়নি, অসাধারণ সংযমের মধ্যে চরম বিপ্লবটি ঘটে গেছে।''[৭২]

আনন্দবাজার পত্রিকা লিখলো, ''মানুষের দেবত্বে উত্তরণ, না, দেবত্ব থেকে অবতরণ মানুষের জগতে? ত্রিতীর্থের 'দেবাংশী' এ দুই পর্যায়ভুক্ত এক ব্যক্তির আসল উপলব্ধির কথা বলেছে। বলেছে খুব সহজ করে, উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় .....। না, ভাষাটাই শুধু আঞ্চলিক নয়, আসলে গোটা প্রয়োগটাই বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে।''[৭৩]

দ্য ইকনমিক টাইমস পত্রিকায় ''Harimadhab Mukherjee's play, structured on Abhijit Sen's story material, probes the superstition prone psychology of the rural poor, steeped in myth- ridden folk culture originating from the feudal/ semi-feudal social structure. The villagers' blind faith in divine prowess sometimes extends so far as to regarding one of their own folks to be of divine extraction, Mukherjee catches a typical rural situation of west dinajpur district and adroitly embroiders this myth-process into a framework of exploitation and class conflict. The playwright's credit lies in avoiding the cliches that generally go with this familiar hunting ground of radical playwright. He emphasises not upon vivid descriptions but upon characteristic vignettes.''[৭৪]

''আমাদের দেশে মৌলিক নাটকের অভাব আছে, মৌলিক চিন্তারও। অথচ আমাদের নিজেদেরই এত সমস্যা আছে, যেগুলি সংবাদপত্রে ছ-এর পাতায় পঞ্চম কলমে আট লাইনে ছাপা হয়। ত্রিতীর্থ সেই উৎসমূলে যান, ক্যামেরার মত শুধু প্রতিলিপি তোলেন না, মনেরও রং লাগান-তার সঙ্গে আছে নিষ্ঠা ও পরিশ্রম, যার জন্য আমাদের বারে বারেই নতুন, ফিরে ফিরে নতুন লাগে।''[৭৫]

বিছন (১৯৮৫)ঃ মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' গল্পটির নাট্যরূপ দেন নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তবে তিনি বাংলা গল্পের হিন্দিতে নাট্যরূপ দেন। 'বিছন' নাটক লেখা প্রসঙ্গে নাটককার উল্লেখ করেছেন-''আমার মনে হয় এই গল্পটা যেন আমাদের এখানকার নয়, মানে বালুরঘাটের তো নয়ই, এমনকি কলকাতা কিংবা বাংলাদেশের গল্প নয়। গ্রামীন জোতদার শ্রেণীর ওই নৃশংস অত্যাচার, এই গ্রাউন্ড রিয়ালিটি-অপারেশন বর্গা-উত্তর সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ছিল না। 'এই জুতি সাফ কর'-দিজস্ থিংস ডাজ নট হ্যাপেন ইন আওয়ার প্লেস, ইন আওয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল। এটা বরং বিহারে হতে পারে। আমি হিন্দি জানি না, যদিও বেশ কিছুদিন শেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু খুব গোলমেলে ব্যাপার''[৭৬]

এই সময়ে তিনি আট দিনের জন্য জলপাইগুড়ি যান একটি নাট্য প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে। ওখানে তিনি রুবি বোর্ডিং এ একটি সেপারেট ঘরে সকাল থেকে সন্ধ্যা

পর্যন্ত বসে বসে 'বিছন' নাটক লিখেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে তিনি বালুরঘাট থেকে যাবার সময় ইসলামপুর থেকে একটা খাতা কিনেছিলেন। সেই খাতাতে তিনি 'বিছন' নাটকটি লেখেন। এরপর তিনি বালুরঘাটে ফিরে আসেন। ''আমার কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ধ্রুবদেব নারায়ণ সিংকে (উনি একদম ছাপড়ার লোক) আমি বলি-'সিং জি আমি একটা অপকর্ম করে ফেলেছি। হিন্দিতে আমি একটা নাটক লিখেছি, আমাকে কিন্তু কারেক্ট করে দিতে হবে।' উনি শুনে-টুনে বললেন-'আচ্ছা, ঠিক আছে'। তো প্রতিদিন আমি নাটকটা নিয়ে গিয়ে পড়ে পড়ে শোনাতাম, উনি ঠিক করে দিতেন। এভাবে স্ক্রিপটা কারেক্ট করে পুরো নাটকটা তাঁকে পড়িয়ে টেপরেকর্ড করিয়ে নিলাম। এইভাবে আমার 'বিছন' নাটকটা লেখা।''[৭৭]

কাহিনিঃ প্রায় মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারে নিপীড়িত বিহারের পটভূমিতে লেখা 'বিছন' নাটকটি। বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জাতপাতে দীর্ণ যে সমাজ সেই সমাজের রূপ মঞ্চে তুলে আনা হয়েছিল। একজন মানুষ যাদের কিছুই নেই তাদের উপর উচ্চ জাতের ধনী মানুষের নিম্নবর্গীয় মানুষের উপর চিরকালীন শোষণের যে চাবুক এই বিংশ শতাব্দীতেও নেমে আসে তার একটি সার্থক কাহিনি 'বিছন'। ভীরু প্রকৃতির কৃষক দুলন কিভাবে ঘটনাচক্রে সাহস সঞ্চয় করে এবং অবশেষে অত্যাচারের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এই নাটকে সেই কাহিনিই বলা হয়েছে। ঠাকুর লছমন সিং এর বিরূদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তার নিষ্ঠুর চক্রান্তের বলি হয় করণ এবং তার অনুগামীরা। ঘটনাচক্রে দুলন জানতে পারে সব কথা। লাশ পাহারা দেওয়ার জন্য লছমন সিং নিযুক্ত করে দুলনকেই। ঘটনা অগ্রসর হয়, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের আগুনে করণের মতোই প্রাণ দিতে হয় দুলনের ছেলে ধাতুয়াকেও। সেই লাশ গায়েব করতেও ডাক পরে দুলনের। এই সব অভিজ্ঞতা দুলনের মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। লাশ গুম করে রাখা পরিত্যাক্ত জমি পাহারা দিতে জন্ম হয় এক অন্য দুলনের। ভীরু দুলন এখন আর কাপুরুষ, ভীতু নয়। লছমন সিং এর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই পরিত্যাক্ত ওই জমিতে বীজ বপন করে দুলন। গ্রামবাসীকে বাঁচানোর স্বপ্ন দেখে সে। ওই ধান গ্রামবাসীদের অন্ন জোগাবে। এদিকে লছমন সিং সব জানতে পেরে উত্তেজনা ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে বন্দুক নিয়ে দুলনকে শিক্ষা দিতে এসে দুলনের হাতে মৃত্যু হয় তার।

ইতিমধ্যে দুলনের মধ্যে ঘটে গেছে এক বিপ্লব। এ এক অন্য দুলন। এই দুলন আর শুধুমাত্র গ্রামবাসীর ক্ষুধার অন্য সংস্থানের কথা ভাবে না। আরও বৃহত্তর চিন্তা নাড়া দিয়ে যায় তাকে। বীজধান তৈরি করবে সে। সেই ধান থেকে ক্ষেতে ক্ষেতে ফলবে ধান। বিপ্লবী চিন্তার প্রতিবাদী আন্দোলনের বীজ দুলন ছড়িয়ে দিতে চায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। স্বপ্ন দেখে নতুন এক জীবনের। নাটকের শেষে দুলন চরিত্রের উত্তরণ এক অন্য মাত্রা নিয়ে আসে।

প্রকৃতিঃ 'বিছন' নাটকটি প্রথম প্রকাশ পায় 'শূদ্রক' পত্রিকায় সংকলন-৪, শরৎ ১৩৯২ বঙ্গাব্দে। প্রথম অঙ্ক ১২টি দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্ক ১৭টি দৃশ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মোট ২৫টি দৃশ্যে নাট্যকাহিনি নাট্যায়িত হয়েছে।

চরিত্রঃ ২১জন চরিত্র। এছাড়াও রয়েছে দু'জন সাংবাদিক, দু'জন পুলিশ এবং লছমনের দু'জন লাঠিয়াল।

ভাষাঃ নাটককার নাটকের বিষয় বস্তু ও স্থান হিসেবে হিন্দি ভাষাকে বেছে নিয়েছেন। ''অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই স্থানীয় এবং বঙ্গভাষী। তবে তাঁরা অত্যন্ত ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সাথে হিন্দি ডায়লগ যেভাবে রপ্ত করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য।''[৭৮]

''পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে নাটকের সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে হিন্দি ভাষায়। কিন্তু মজা এখানেই নাটক দেখতে দেখতে কখনো আলাদাভাবে মনে হয়নি হিন্দি সংলাপ শুনছি- এমনই গতিময় ও সহজ''[৭৯]।

সংলাপঃ কুড়ি নং দৃশ্যে দুলন এর ছেলে ধাতুয়া যখন লছমন সিং এর হাতে নিহত হয়েছে তখন মৃত দেহ পাহাড়াদার দুলনের সঙ্গে লছমনের কথোপকথনে শোনা যায় বাবা হয়েও নিজের মৃত ছেলেকেও পাহাড়া দিতে হয়-

দুলন	-	মালিক।
লছমন	-	আফশোষ বহৎ আপশোষ্। ম্যায়নে ইয়ে নেহি চায়া।লেকিন-
দুলন	-	কিত্না?
লছমন	-	চার।
দুলন	-	মেরা ধাতুয়া?
লছমন	-	(নীরব)
দুলন	-	(লছমনকে দেখে নিয়ে) কি ধার্ ফেক্ দিয়া মালিক মেরে ধাতুয়াকে।
লছমন	-	জমিনমে রাখা গিয়া। মাটি দে দিয়া।
দুলন	-	কি ধার?
লছমন	-	উধার্ -
দুলন	-	(আর্তচিৎকারে ছুটে যায়। মাটিতে মুখ ঘসে) ধা-তু-য়া।
লছমন	-	উঠ্ উঠ্ পিছে রো লেনা। বহৎ কাম হ্যায়।
দুলন	-	হাম্ ইধার্ আনেসে পহেলে ধাতুয়াকো.....
লছমন	-	হাঁ সাথ হি সাথ। জগতার নে মাটি দে দিয়া।
দুলন	-	আপ্ বহুৎ সমঝদার আদমী হ্যায় মালিক। বাপ্কো বেটাকী লাশ হাসিল করণে নেহি দিয়া আপনে। বহৎ এহ্সান কিয়া আপনে মুঝ্পর।
লছমন	-	উঠ্। ইয়াদ রাখ্না, জবান না খুলে। নেহি তো তেরা এক বেটা হ্যায়।

মন্ত্রশক্তি (১৯৮৮)ঃ

স্বর্ণমল ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় লেখেন 'মন্ত্রশক্তি' নাটক। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের গল্পের কেন্দ্রে ছিল তেভাগা আন্দোলন বিশেষত বৃহত্তর অর্থে কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল দক্ষিণবঙ্গে এবং কিছু অংশ উত্তর বঙ্গেও বটে। মন্ত্রশক্তি নাটক সম্পর্কে নাটককার বলেছেন- '' 'মন্ত্রশক্তি'র কাহিনী কিন্তু উত্তরবঙ্গের একটি অঞ্চলের কৃষকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, আর যার কেন্দ্রে ছিলেন

একজন নারী যশোদা বর্মন। তখন খাঁপুর এ জমাদার ছিলেন নিখিল চক্রবর্তী। তাঁর কাছে আমি ঘটনার বিবিরণ শুনি। নাটকটি লেখার সময় সেগুলো নানাভাবে ব্যবহার করি এবং যশোদা বর্মন নামে চরিত্রটি রেখেদি। বাস্তবে যশোদা বর্মন গুলি খেয়ে মারা যান। কিন্তু এই যশোদা বর্মন অপরাজেয় সংগ্রামের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।''[৮০]

নাটককার উল্লেখিত 'উত্তরবঙ্গের একটি অঞ্চলের'উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলটি হল বালুরঘাট মহকুমার খাঁপুর-নিশ্চিন্তা গ্রাম। ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে বাংলার অন্যান্য স্থানের চাষীদের মত এখানকার চাষীরাও আন্দোলন গড়ে তুলেছিল-তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের ২০ই ফেব্রুয়ারী খাঁপুর গ্রামে পুলিশের গুলিতে বাইশ জন চাষী মৃত্যুবরণ করেন। এই প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচিত।

'মন্ত্রশক্তি' নাটকটি প্রথম প্রকাশ পায় 'বসুমতী' পত্রিকায় শারদীয়া ১৪০১ বঙ্গাব্দে। 'মন্ত্রশক্তি' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ পায় একুশের বইমেলায়, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ (১৪০৫ বঙ্গাব্দে) প্রকাশক বড়াল প্রকাশনী, ৩৬/৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০।

কাহিনিঃ উত্তরবঙ্গের এক অঞ্চলে কৃষকদের আন্দোলন আশ্চর্য তীব্রতা পেয়েছিল, যার কাছে পরাস্ত হয় পুলিশ বাহিনী। এই আন্দোলন অসামান্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল জনৈক সামসের-এর নেতৃত্বে। যাকে খুঁজে বের করতে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল পুলিশ কর্তারা। পরে অবশ্য জানা যায়, সামসের বলে কেউ কোনো দিনই ছিল না। সমগ্র আন্দোলনটি পরিচালনা করেছিলেন এক সাধারণ রমনী, সামসের আড়ালে, যার নাম যশোদা বর্মন। কেমন করে তিনি নি:শব্দে কৃষকদের সংগঠিত করেন, কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষকেও, কেমন করে তিনি পুলিশকে কার্যত বন্দী করে থানা লুঠ করিয়ে বন্দুক ছিনিয়ে আনেন এবং কেমন করে মাঠ ভর্তি ফসল তুলে দেন কৃষকদের হাতে-'মন্ত্রশক্তি' তারই কাহিনি।

প্রকৃতিঃ পূর্ণাঙ্গ, দশটি দৃশ্য।
চরিত্রঃ ২৯জন চরিত্র। এছাড়াও যাত্রা ও যাত্রার দর্শক হিসেব বহু মানুষ রয়েছে।
ভাষাঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের কথ্য ভাষায় সংলাপ লিখিত। তবে দারোগার মুখে মান্যচলিত বাংলা ভাষা বসিয়েছেন নাটককার।

সংলাপঃ দশম দৃশ্যে যশোদা বর্মনের নেতৃত্বে যখন রসুল সামসের, যশোদার স্বামী, কালি ডাক্তার সকলে মিলে বুদ্ধির ফাঁদে দারোগাকে আটকে রেখেছে। তে-ভাগা আন্দোলন চরমে উঠেছে-ভোর বেলা থেকে ধান কাটা শুরু হবে -

দারোগাঃ	-	এই যশোদা এসব কি হচ্ছে? সেপাই যাও। এই কালি এগুলোন কি? রাইফেলগুলো দিয়ে যাও।
সেপাইঃ	-	হামকো লেংড়া বানা দিয়া সাহাব।
দারোগাঃ	-	এই মাখন যাও ক্যাম্পে গিয়ে খবর দাও।
যশোদাঃ	-	যাবেন নাকি মাখন বাবু খবর দিবা? (মাখন চারিদিকে দেখে।

বোঝে দুরন্ত প্রতিরোধ। সে নিশ্চল থাকে)।

দারোগাঃ – ওফ্ সেপাই গুলো যে কী করছে।

যশোদাঃ – সিপাইরা ব্যাবাক চৌকিত আটক পড়িছে দারোগাবাবু।

দারোগাঃ – (রসুলকে দেখে) রসুল তুই তুই ..... হা ভগবান। (মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে)

যশোদাঃ – আহা: দারোগাবাবু মাটিতে বইসবেন না। বারান্দাত যায়ে বসেন। ইখানে হিম পড়ছে। আলি সাহেব, মুখটিবাবু আপনারাও যান। আপনাদের অনেকক্ষণ আটক থাকা নাইগবেতো?

দারোগাঃ – মানে?

যশোদাঃ – সূর্যি উঠতে না উঠতে মাঠে ধান কাটা শুরু হোবে। তে-ভাগা বুঝিছেন। দুদিন সারাদিন সারা রাইত ধান কাটা চইলবে নিশাপুর, ভাতিন্দা, চড়কডাঙ্গা এই তিন গেরামে। আপনেরা আমার এই বারান্দাত বইসে থাকবেন। ভয় নাই দারোগাবাবু পাহারা থাইকবে।

আলিঃ – যশোদা আমাহরে ছাইড়ে দাও নাতে ভুল কইরবা। আমার বাড়িত দুটা বন্দুক আছে।সিটা চালাবার লোকও আছে।

মুখুটিঃ – আমারও এটা আছে।

যশোদাঃ – আপনাহরের বন্দুক আছে আমরা জানিনা ভাবিছেন?

আলিঃ – তাইতো কছি ছাইড়ে দাও।

যশোদাঃ – আপনারা দুজনতো ইখানে বন্দুক চালাবে কে? আপনার ব্যাটা আর মুখুটি বাবুর ভাইগ্না তো? ওরা তো কুসুম ধোপানির ঘরোত আটক।

নাটকটির চরিত্র দক্ষিণ দিনাজপুরের কোনো গ্রামের। তাই চরিত্র গুলি মন্ত্রে বিশ্বাসী। আবার কখনো ছড়া কেটেছে কেউ কেউ। দেখা যায় গ্রাম্য জীবনে বিনোদনের জন্য যাত্রার আসর। প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় রসুল চোর। সে চুরি করতে যাওয়ার পূর্বে তাঁর স্ত্রী তাকে মন্ত্র পড়ে গায়ে ধুলো ছিটিয়ে দিচ্ছে। রসুল বিশ্বাস করে তার বউ এর মন্ত্রে সে কয়েকবার বিপদ থেকে রক্ষা পয়েছে। মন্ত্রটি এই রূপ-

‘‘কপপল ঝপ্পল খপ্পল
সাপা-বাঘা-লোহা-লাঠি
নিচ্চল, নিব্বল, নিমফল
ঘুম থাক রাইত ভর নিচ্চল
স্বপ্পন চোখ্খের কাজ্জল
কপ্পল ঝপ্পল খপ্পল’’

গানঃ পঞ্চম দৃশে **১**টি গান- ‘পিড়ীতি সাগরে ডুবিয়া মরিব’

নবম দৃশ্যে ১টি গান-'ওরে তোর পীড়ণ যত কঠিন হবে-'
দশম দৃশ্যে ১টি গান- 'রণে সাজিল রে
রণ ডঙ্কা বাজিল রে
তে-ভাগা শুরু হইল দেশে'
প্রথম অভিনয়ঃ ১৯৮৮ ৩রা এপ্রিল ত্রিতীর্থ, গোবিন্দ অঙ্গন, কল্যান মঞ্চ।

অনিকেত (১৯৯০)ঃ

নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী নাটকগুলি থেকে 'অনিকেত' এর অমিল অনেক। তিনি এতদিন গ্রাম্যজীবনের সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন কিন্তু 'অনিকেত' নাটকটিতে তুলে ধরা হয়েছে আধুনিক শিক্ষিত একটা পরিবারের সংকট। 'অনিকেত' নাটক লেখার প্রেরণা সম্পর্কে নাটককার দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। প্রথম ঘটনা ''বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে একটি মেয়ে পড়াত। ঐ মেয়েটি নিয়মিত আমাদের থিয়েটার দেখত। একদিন আমাকে বলল-'মাধবদা, আপনি মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে নাটক করেন না কেন? মধ্যবিত্তের জীবনে কী নাটকে উপাদান নেই?' এই কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। ঠিকই তো মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে নাটক করা যেতে পারে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ভেরি ইন্টারেস্টিং। কলকাতা গেছি (প্রথম ঘটনাটির কিছুদিন পর) বাংলাদেশের কোনো একটা নাটক দেখতে। নাটক দেখে বালুরঘাট ফেরার জন্য বাস ধরব, সাড়ে ন-টায় বাস, সঙ্গে অরুণদা (মুখোপাধ্যায়) ছিলেন। অরুণদা বললেন, 'চলো মাধব, তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি'। আমরা একসঙ্গে আসতে আসতে অরুণদা বললেন-'বুঝলে মাধব আশাপূর্ণার একটা গল্প পড়লাম। এতো ভালো লাগল, গল্পটার নাম আমার মনে পড়ছেনা, কিন্তু বড়ো ভালো।' আমি বললাম-'বিষয়টা ছোট করে বলুন তো' অরুণদা বললেন 'একটা ভদ্রলোক-দূর সম্পর্কের আত্মীয়, একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই বাড়ির ভদ্রমহিলার স্বামী হঠাৎ মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পর যে ক্রাইসিস্টা তৈরি হল- ওই ভদ্রলোক কি বাড়িতে থাকতে পারবেন, নাকি চলে যাবেন? প্রায় সমবয়সি একজন বিধবা মহিলার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকা, সমাজ কি এটা মেনে নেবে?' এই রকম মধ্যবিত্তের খুব জটিল একটা ক্রাইসিস্ ধরা ছিল গল্পটাতে। আমি শুনলাম, এন্ড দেন আই স্টার্ট থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট থ্রু আউট দ্যা হোল বাস। মাথার মধ্যে ঘুরে ফিরে ওই ক্রাইসিস্টার কথা চেপে বসল। বাড়ি ফিরেও তার রিপারকেশনটা চলতে থাকল। অন দ্য থার্ড ডে, আই স্টার্টেড রাইটিং অনিকেত। অথচ আশাপূর্ণা দেবীর গল্পটা আমি তখন পড়িনি, এমনকি এখনও পর্যন্ত আমার পড়া হয়নি।''[৮১]

কাহিনিঃ

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় যে প্রিয়তোষ সান্যালের দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই। দেবব্রত ওরফে দেবুর বোহেমিয়ান চরিত্র তাকে কোনোদিন কোথাও স্থির থাকতে দেয়নি। যাঁর সমাজ জীবনে কোনো শিকড় নেই। একদিন হঠাৎ সে তাঁর মামাতো ভাই প্রিয়তোষ সান্যালের বাড়িতে আসেন। প্রিয়তোষ তার সহজ সরল স্বভাবে আকর্ষণ বোধ করেন। দেবু ত্রিশ বছর প্রিয়তোষের বাড়িতে কাটিয়ে দেয়। দেবু ভালো ছবি আকঁতো। দেবু ধীরে ধীরে প্রিয়তোষের পরিবারের প্রিয় হয়ে ওঠে। সে সকলের প্রিয় 'দেব-কা' ওই পরিবারের সে সর্বময় কর্তা রূপে পরিচিত হয়। দেবু প্রিয়তোষের স্ত্রী মনোরমার সমবয়সী হওয়ার ফলে দু'জনের মধ্যে গড়ে

ওঠে পবিত্র বন্ধুত্বের সম্পর্ক। রাণা বিয়ের পর তার স্ত্রী অদিতিকে নিয়ে যায় বোম্বে। রুচির বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সে চলে যায় শ্বশুড় বাড়ি। সংসার থাকে কেবল প্রিয়তোষ, মনোরমা ও দেবু। সমস্যা শুরু হয় প্রিয়তোষের মৃত্যুর পর। শ্রাদ্ধ শান্তির পরে যখন ছেলেমেয়ে ফিরে যাবে তখন তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে প্রশ্ন রাখেন-দেবু এখন কোথায় থাকবে? মায়ের এই প্রশ্নে সন্তানেরা কোনো নৈতিকতাবোধ খুঁজে পায়না, তারা বিস্ময়বোধ করে। এখানে নাটকের জটিলতা সৃষ্টি হয়। নাটককে নিয়ে যায় অন্য মাত্রায়। একই ছাদের নীচে কোনো নারী পুরুষ একসাথে থাকতে পারে না যদিও তাঁরা আপাতত পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ। রাণার স্ত্রী মা-দেবকার মধ্যে শারীরী সম্পর্কের প্রশ্নটি উস্‌কে দেয় ছেলে রাণা ও মেয়ে রুচিরার মধ্যে। কিন্তু এটাই কি নির্মম সত্য? বর্তমান প্রজন্ম নিজেদের প্রগতিবাদী বলে দাবি করে। সংস্কার মুক্ত মনা নিজেদের মনে করে। আসলে তারা কত বেশী সংস্কারাচ্ছন্ন তারই বিশ্লেষণ দেখতে পাই এই নাটকে। সামাজিক অনুশাসন, সাংসারিক জটিলতায় দেবকার এই ত্রিশ বছরের নিকেতন হয়ে ওঠে অনিকেত। আবার দেবুর ফিরে যায় তাঁর যাযাবরী শিল্পী জীবনে- সেটাই তার জীবনে স্বাভাবিক চলার পথ। দেবু চলে যাওয়ার সময়ে মনোরমাকে একটা পোট্রেট দিয়ে যায় যেটা ছিল একটা জোকারের ছবি- এটি বহু অর্থবহ হয়ে দাড়ায় দর্শকের সামনে।

প্রকৃতিঃ চারটি দৃশ্যে নাটক সমাপ্ত।
চরিত্রঃ আটজন।
ভাষাঃ মান্য চলিত বাংলা। কিছু ইংরেজীর মিশেল আছে।
সংলাপঃ প্রথম দৃশ্যে প্রিয়তোষের বিয়োগে মনোরমা দেবু-র সঙ্গে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। কারণ মনোরমা জানে তাদের পবিত্র বন্ধুত্ব কুলসিত হবে। তাই তার ছেলেমেয়েদের কাছে দেবুর অন্য কোথাও থাকার আর্জি জানিয়েছে।

মনোরমা: বলছিলাম এখন থেকে দেবু কোথায় থাকবে?
রুচিরা: কেন? এখানে থাকবে। এই বাড়িতে।
মনোরমা: কথাটা কি ভেবে বলছো?
রাণা: এর মধ্যে ভাবাভাবির কি আছে?
মনোরমা: আছে। কাল কিম্বা পরশু তোমরা যে যার জায়গায় চলে যাবে। এই বাড়িতে দেবু এবং আমার কি একসঙ্গে থাকা চলে?
রাণা: এতদিন তো ছিলে।
মনোরমা: তখন তোমার বাবা বেঁচে ছিলেন।
রাণা: তার মানে বাবার অবর্তমানে দেবকা এ-বাড়িতে থাকতে পারবে না?
মনোরমা: আমার বিবেচনায় থাকা উচিৎ নয়?
রাণা: This is the most unkindest cut of all লোকটা সারাজীবন এই সংসার ... আমাদের জন্য ও: ভাবা যায়? এ বাড়ির প্রত্যেকটা ইট ঐ লোকটা গাঁথিয়েছে। এই বয়সে লোকটা কোথায় যাবে?
মনোরমা: কোথায় যাবে সেটা তোমরা ঠিক করবে।
গান: তৃতীয় দৃশ্যে একটি রবীন্দ্রসংঙ্গীত (প্রেমের জোয়ারে) আছে।
প্রথম অভিনয়ঃ ২৫শে এপ্রিল ১৯৯০, ত্রিতীর্থ, গোবিন্দ অঙ্গন, কল্যান মঞ্চ।

পত্র শুদ্ধি(১৯৯৯)ঃ পত্রশুদ্ধি নাটকের বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। নাটকটির বিষয় বস্তুতে রয়েছে একজন গ্রাম্য বধূর সাক্ষর হয়ে ওঠার কাহিনি। রেশন এর দোকানের কর্মচারী বলাই মোটামুটি লেখাপড়া জানে কিন্তু তাঁর স্ত্রী কানন নিরক্ষর। এই সুযোগে বলাই তার গোপন প্রেম বজায় রেখেছে। অশিক্ষিত শান্ত, সরল প্রাণের কাননকে বলাই এর নামে প্রেম পত্র আসে আর বলাই উকিলের চিঠি বলে তা গোপন করে। বলাই প্রতি শুত্রবার বাড়ি থেকে বের হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে। এই ঘটনায় ধীরে ধীরে কাননের মনে সন্দেহের দানা বাঁধে। সাক্ষরতা কেন্দ্রের দিদিমনি মধুমিতার সহায়তায় বলাই এর কাছে আসা চিঠি গুলি যে প্রেমপত্র তা কানন বুঝতে পেরে কষ্ট পায়। কানন ঐ দিদিমনির সহায়তায় পড়াশোনা শিখে বলাই এর মুখোশ খুলে দেয়। বলাই নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাননের কাছে আত্মসমর্পন করে।

প্রকৃতিঃ নাটকটি প্রথমে একাঙ্ক ছিল। পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে।
চরিত্রঃ ১৯ জন এবং গ্রামের যাত্রাদলের কয়েকজন পুরুষ।

সংলাপঃ নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটকের প্রতিটি চরিত্রকে জীবন্তও বিশ্বাস যোগ্য করে তুলেছেন তাদের মুখে তাদের নিজেদের ভাষা প্রয়োগ করে। দক্ষিণ দিনাজপুরের কথ্য ভাষায় যথোপযুক্ত প্রয়োগ করে তিনি হাসি ও মজার মধ্য দিয়ে নাটকের বৃত্তটি গড়ে তুলেছেন। কথ্য ভাষার প্রয়োগটি বেশ লক্ষ্য করার মত।

কাননঃ মালিক জাইনলো কী করে যে আইজ চিঠি আসিছে।
বলাইঃ আরে হিসাব আছে না। হপ্তায় হপ্তায় চিঠি আইসবে মালিক জানে।
কাননঃ যে দিনই চিঠি আসে ..... মালিকের বাড়িত যাও আর ফির মধ্য রাতে।
বলাইঃ মধ্য রাত? এনা রাইত হয়। কী করমো ক। মালিক ছাড়া না যে। গল্পগুজব হাসি ঠাট্টা ..... রাইত হয়া যায়।
কাননঃ বাড়িত তো কখনও গপ্প গুজব হাসি ঠাট্টা কর না।
বলাইঃ বাড়িত?
কাননঃ হঁ।
বলাইঃ কার সাথে গল্প করমো? তোর সাথ?
কাননঃ ক্যান মুই কি মানুষ না?
বলাইঃ সে কথা মুই কইচি?

মূল কাহিনির সঙ্গে আরো কতকগুলি বিষয় উঠে এসেছ যা গ্রাম্য সমাজে আজও বিরাজ করে। তুক্তাক জুরিবুটির সাহায্যে রুজিরোজগারের ব্যাপারটি এখনও গ্রাম্য সমাজে মানুষগুলিকে এখনও ঠকিয়ে চলেছে।

আকলু - ছাড়ান দেন, ছাড়ান দেন এলা কথা। মোর মুশকিল আসান করেন।
বৃন্দা - চাল পইড়ে দেছি। যাক সন্দেহ হয় কায়দা করে তাক.....
আকলু - নানা চাল পড়াত কেছু হয় না, এর আগে তিনবার.....
বৃন্দা - তবে তা বাণ মারা নাইগবে। হোম যাগ এলা করা নাইগবে। তার

খরচাপাতি তো বিস্তর।

আকলু - খরচাপাতির জন্য চিন্তা নাই। আপনি করেন।

যদিও আধুনিক যন্ত্রশক্তি গ্রামের মানুষও ঘরমুখি হয়ে উঠেছে তবুও দেখা যায় এখনও মানুষ তার মনের খোরাকের জন্য সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর গ্রামের মানুষ মিলিত হয় একটু আনন্দ পাওয়ার জন্য। নাটকটিতে দেখা যায় কৃষ্ণযাত্রা হবে, অধিকারী মশাই গ্রামের মানুষদের নিয়ে মহড়া চালাচ্ছেন। গ্রামের মানুষ সঠিক শব্দ উচ্চারণ করতে পারছে না, অধিকারী মশাই তবুও তদের দিয়েই অভিনয় করানোর চেষ্টা করছে এবং এর মধ্য দিয়েই তারা জীবনকে উপভোগ করছে।

অধিকারী - এই কিরে কি হচ্ছে এলা। ঢিল খাবু নাকি। তুই কি বেটা ছিলা? গলা চিকন কর। শালা এতোবার কইছি, মনোৎ থাকে না? নি ক।

কুটিলা - দেখো গিয়ে কুড়াতেছে খুব কাশি আসে যায়।

অধিকারী - এই চুপ। কাশি আইসে যায় বাড়িত কী করিস। পেক্‌টিশ করবা পারিস না।

ছিদাম - বাড়িত এমকা কইরে কথা কমো।

অধিকারী - হ কবু।

ছিদাম - হুর বৌ ভাইববে অক্‌ ভেঙাছি। নাইগে যাবে চুলাচুলি।

প্রথম অভিনয়: ২৬ আগষ্ট ১৯৯৯, ত্রিতীর্থ গোবিন্দ অঙ্গন, কল্যান মঞ্চ।

সন্ন্যস্ত (১৯৯৪)ঃ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় লিখিত সন্ন্যস্ত, নাটকটির বিষয়বস্তু হল-মৃতের তালিকা থেকে একনিষ্ঠ উগ্রপন্থী বিপ্লবী হিরন্ময় ফিরে আসে ১৯৭৬ এ কলকাতায় যখন সরকারী প্রচেষ্টায় উগ্রপন্থা স্থিমিত প্রায় নির্মূল। ছাত্রজীবনের বিবাহিত প্রণয়ী রূপালীর জীবনে ঘনিয়ে আসে সংকট। হিরন্ময় কি তাকে স্ত্রী বলে দাবী করবে? সে যে এখন নতুন জীবন বরণ করতে চলেছে। শাসকগোষ্ঠী প্রাণপন চেষ্টা করে হিরন্ময়কে তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করতে, তাকে দলভুক্ত করতে। হিরন্ময় বুঝতে পারে তার প্রণয়ই অন্য নতুন জীবন চিন্তা করছে। সে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের কাগজটি ছিড়ে দিয়ে অনির্দিষ্ট জীবনে বেড়িয়ে পড়ে।

প্রকৃতি - পূর্ণাঙ্গ

চরিত্র - ২৩জন

ভাষা - চলিত বাংলা

প্রথম অভিনয়-'সন্ন্যস্ত' নাটকটি কালিয়াগঞ্জের 'অন্যন্য' নাটকগোষ্ঠীর প্রযোজনায় ও নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ৫ই জানুয়ারী ১৯৯৪ সালে ত্রিতীর্থের ২৫ বছর পূর্তিতে মঞ্চায়িত হয়। কালিয়াগঞ্জের প্রায় সমস্ত দলের অভিনেতাই ছিল।

অসমাপিকা (২০০৩)ঃ

'অসমাপিকা' নাটকটি পণ প্রথার উপর ভিত্তি করে রচিত। নাটকটির কাহিনি বর্নিত হয়েছে এই ভাবে-সুরেণ হাজরা তার ছেলে সুখেনের বিয়ে দেয় আশালতার সঙ্গে। আশালতার বিয়েতে পণের টাকা মিটিয়ে দিতে না পারার ফলে শ্বশুড় বাড়িতে গ্রহণ যোগ্য হয় না ও নিত্য অশান্তি লেগে থাকে। বাবার দোকানের মাস মাইনের কর্মচারী সুখেন স্ত্রীর উপর অত্যাচার হচ্ছে জেনেও নির্বিকার থাকে। নিরাশ আশালতা স্বামীকে ত্যাগ করে বাবার বাড়ি চলে আসে। আশালতা জানতে পারে তার বাবা ত্রিশ হাজার টাকা পণ দিয়ে বিয়ে দিয়েছিল। তাই হারাধন পাল বিয়ে করতে চাইলে আশালতা ত্রিশ হাজার টাকা দাবী করে কারণ সেই টাকা আশালতা বাবাকে ফেরৎ দিতে চেয়েছিল। আশালতা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিল কোথাও তার দাঁড়াবার জায়গা নেই। চারিদিকের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে আশালতা নিজেকে মেলাতে পারবে না। সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ তার যেন অসম যুদ্ধ। একজন নারী আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে ধিক্কার জানিয়েছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে।

প্রকৃতি - পূর্ণাঙ্গ
সংলাপ- নাটকটি মালদা জেলার কথ্যভাষায় রচিত।

ননী: কবে দিবে এ্যাঁ, কবে দিবে পণের বাকি টাকা? (কথাগুলা আশালতার উদ্দেশ্য ছুড়ে দেয় ননীগোপাল) চল্লিশ হাজার রফা হল, তো দিল ত্রিশ, দশ হাজার টাকা আজ একবছর হল পরে আছে উহার কাছে। মিয়া শ্বশুড় বাড়ির ভাত ধ্বংস করছে। আর হামার হকের টাকা গিরিজা সরকারের বাড়ি ডিম পাইড়ছে। লজ্জা নাই সরকারের। আমি তখনই কহেছিলাম টাকা হাতে না পেলে ছেলেকে বিহাত বসাবা না। শুনেছিলা হামার কথা?

সুরেন: তোমার ছিলাক কহো গিয়া। কহিলাম গিরিজা সরকার দশ হাজার এখনো দেয় নাই। চল বাড়ি ফিরা যাই। শুনে তোমার ছিলার মুখে আষাঢ়ের ম্যাঘ নাইমলো। শালা ভেরুয়া। আর ঠিক সেই সময় সরকার আইসে হাত কচলাইয়াতে লাইগলো, মিয়াটাকে হামার উদ্ধার করেন হাজরা মশাই। কথা দিইছি সুখেন বাবাজী যখন ফির নিতে আইসবে উহার হাতে হাজার হামি পাঠাই দিব। যদি চান দশ জনার সামনে বিহার আসরে হামি কবুল করছি।

ননী: তো সরকারেক দিয়া বিহার আসর কথাটা কবুল করালা না ক্যান।

প্রথম অভিনয়ঃ ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০৩, ত্রিতীর্থ গোবিন্দ অঙ্গন, কল্যান মঞ্চ।

যদি এমন হতো (২০০৭)ঃ

নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 'যদি এমন হতো' নাটকটিতে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু চিত্তের যে নিপীড়ণ তা তুলে ধরেছেন। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বারবার আলোচিত হয়েছে 'স্কুলছুট' ছাত্র ছাত্রীদের সমস্যা। নাটককার শিশু এবং কিশোরদের মানসিকতার উপরে আলোকপাত করেছেন এই নাটকে। শিক্ষকরা চার দেওয়ালের মধ্যে যে শিক্ষা দেবেন সেই শিক্ষা তো কেবল বই সর্বস্ব শিক্ষা। যারা পড়তে চায় না প্রকৃতিকে ভালোবাসে শিক্ষক মহাশই তাদের খেলতে খেলতে শেখান। নদীর ধারে ছাত্রকে নিয়ে গিয়ে

তার কল্পনা শক্তিকে বাড়িয়ে তোলেন। নাটককার 'যদি এমন হতো' নামের মধ্য দিয়েই সেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

নাটকটি বালুরঘাট হাইস্কুলের ৫ম ও ৭ম শ্রেণীর কিছু ছাত্র অভিনয় করে। তাদের অসাধারণ অভিনয় প্রমাণ করে ছেলেদের মধ্যে যে কত প্রতিভা রয়ে গেছে। অথচ মানুষ করার ইঁদুর দৌড়ে অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক চাপে তা উন্মেষের সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে। খেলার সাথে পড়া, আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণের অতীত দিন গুলো দর্শকের সামনে ফুটে ওঠে।

প্রকৃতিঃ একাঙ্ক
চরিত্রঃ ২০জন
ভাষাঃ বালুরঘাটের স্থানীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তবে ঘোষক মান্য চলিত বাংলাতে কথা বলেছে।

সংলাপঃ

অমূল্য: -মোটে দশ আঁটি কাটিছ। বিহান থেকে বসে বিকাল তক দশ আঁটি খ্যাড় কাটিছিস তুই। না না তোক রাখে আমার কোনো কাম নাই। সকালে পান্তা দুপুরে ভাত, ফির মাস গেলে তিরিশ টাকা নানা তোক রাখা আমার পোষাবে না।

বিশু: -কুনদিন কাটিনাই তো।

অমূল্য: -সে কি রে তুইতো মোক অবাক করলু। তোর বাপ যে কল গরু বাছুরের ব্যবাক কাম পারিস। তোর বাপ তবে মোক মিছা কথা কল? (বিশু নিরুত্তর)

অমূল্য: -সত্যি কথা কতো তুই এর আগে কার বাড়ীতে কাম করতিস?

বিশু: -কারও বাড়ীত নয়।

অমূল্য: -কাম কাজ কিছু করতিস বাড়ীত?

বিশু: - না।

অমূল্য: -তবে কি করতিস?

বিশু: -ইসকুলে পড়তাম।

অমূল্য: -ইসকুলে পড়তিস? কোন কেলাসে?

বিশু: -কেলাস টুতে।

অমূল্য: -পড়া বাদ দিলে ক্যানে?

বিশু: -বাপ জানে।

গানঃ আটটি কোরাস রয়েছে।
প্রথম অভিনয়ঃ ২৬শে আগষ্ট ২০০৭ ত্রিতীর্থ, গোবিন্দ অঙ্গন, কল্যান মঞ্চ।

<u>সম্মানিত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়:-</u>

১৯৭০ সালে লক্ষ্মৌতে সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক, প্রতিযোগিতায় 'নাট্যকারের সন্ধানে

ছটি চরিত্র' অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেন।
দিশারী - ১৯৭৬, ১৯৭৯,
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি - ১৯৮৭ ('বিছন' - শ্রেষ্ঠ অভিনেতা)
দিশারী গোল্ডেন পুরস্কার - ২০০৩
কাঞ্চনজংঘা পুরস্কার - ১৯৯৪ সঙ্গীত নাটক আকাদেমি - ২০০৭
রাজ্য আকাদেমি (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) - ২০০৮
দীনবন্ধু পুরস্কার (নাট্য আকাদেমি) - ২০০৯
বঙ্গভূষণ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) - ২০১১

শুভ্রাংশু মৈত্র (১৯৪৩):

বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নওগাঁতে ১৯৪৩ সালের ২৫শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জিতেশ্বর মৈত্র। শুভ্রাাংশু মৈত্র ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। পিতা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা, তাঁরই প্রভাবে বাল্যকালেই নাটকের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়। যৌবনে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য কলকাতায় তিনি বিভিন্ন নাট্য সংস্থার টিকিট বিক্রি করতেন। সেই সুবাদেই তিনি বিভিন্ন থিয়েটারের নাটক দেখার সুযোগ পেতেন। ১৯৬৬ সালে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। বালুরঘাটে এসে বিভিন্ন সংস্থায় যেমন তরুণতীর্থ, ত্রিশূল, নাট্যমন্দিরে নাটক দেখতেন। 'ত্রিতীর্থ' নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আজীবন ত্রিতীর্থের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মূলত তিনি একজন সুদক্ষ চিত্রশিল্পী। অলংকরণ এবং বিশেষ কোনো সময়কে মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ছিলেন অপরিহার্য। তাঁরই পরিকল্পনায় 'গ্যালিলেও' নাটকের পোশক - পরিচ্ছেদ আসবাবপত্র ইত্যাদি বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। তিনি দক্ষ অভিনেতা ছিলেন। 'ত্রিতীর্থ' নাট্য সংস্থাতে তিনি অভিনয় করেছেনে- 'দেবীগর্জন' (সাঁওতাল সর্দার) 'তিন বিজ্ঞানী' (আইন স্টাইন), 'অর্থম - অনর্থম' (প্রধান চরিত্র), 'জল' (উচ্চবর্ণ হিন্দু), 'তুঘলক' (আজীজ) প্রভৃতি নাটকে অসাধারণ অভিনয় করেছেন।

নাটককার শুভ্রাংশু মৈত্রঃ

গতানুগতিক চিন্তার বাইরে নাট্যবস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আগ্রহে তিনি নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'বন্দীসম্রাট'(পঞ্চাঙ্ক), চন্দ্রগুপ্তের জীবন অবলম্বনে লেখা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তের সংকটকে স্থাপন করে এই নাটকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন চন্দ্র গুপ্ত কার্যত চানক্যের তৈরি একটি গিনিপিক। 'বন্দীসম্রাট' নাটকটি ১৯৭৬ সালে ত্রিতীর্থে অভিনীত হয়। তাঁর দ্বিতীয় নাটক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম খন্ড অবলম্বনে লেখা 'বহুরূপী'। নাটকটি ১৯৭১-৭২ সালে লেখা কিন্তু ত্রিতীর্থে অভিনীত হয় ১৯৭৫ সালে। মধুপর্ণী পত্রিকার বিশেষ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিল। ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে তিনি বানর্ডশ এর How 'to tall a lai' অবলম্বনে 'কেমনে তারে মিছে বলা যায়' ১৯৮৬ সালে ত্রিতীর্থে মঞ্চস্থ হয়। তাঁর 'পদ্মাবতী কথা' বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তূণীর নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় ও ভবন্দেু ভট্টাচর্য মহাশয়ের পরিচালনায় ১৯৯৭ সালে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটিতে শ্রেণী বৈষ্যমের কথা তুলে ধরা হয়েছে। চাঁদবেনেকে

এখানে উচ্চকটির প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়। অপর দিকে মনসাকে নিম্নবর্গীয় মানুষ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রকৃতি-তিনটি অঙ্কে মোট সাতটি দৃশ্য।

ভাষা: দুই রকমের বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। চাঁদবেনের কথাবার্তা একদম উচ্চকোটির মানুষের ভাষা- মান্য বাংলা ভাষা। বাকি অন্যদের ভাষা ছিল মাটির গন্ধ পূর্ণ একদম লোক ভাষা।

গান: নাটকটির গান রচনা করেছেন যিষ্ণু নিয়োগী, সুর আরোপ করেছেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য নাটকটিতে মোট সাত-আটটি গান রয়েছে।

তিনি উত্তরবঙ্গের 'দিব্যক' বিদ্রোহের ভিত্তিতে একটি নাটক রচনা করেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি। তিনি দুটি তামিল মহাকাব্যের নাট্যরূপ দিয়েছেন। প্রথমটির নাম 'শিলাপ্পদিগরম' দ্বিতীয়টির নাট্যরূপ দিতে দিতে তিনি ২০১২ সালে পরলোক গমন করেন।

ভাস্কর চ্যাটার্জী (১৯৫৩)ঃ নাটককার ভাস্কর চ্যাটার্জী ১৯৫৩ সালে ১লা জুন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিকুঞ্জ বিহারী চ্যাটার্জী, মাতা সাধনা দেবী। পিতা নিকুঞ্জ বিহারী ছিলেন নামকরা উকিল। বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে কমার্স নিয়ে ১৯৬৯ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। বালুরঘাট কলেজ থেকে কর্মাসে বি. এ. পাশ করেন ১৯৭৩ সালে।

তিনি বর্তমানে একজন সাংবাদিক। তাঁর নেশা নাটক লেখা, অভিনয় ও নির্দেশনা। তিনি আবার গল্পকারও বটে। তাঁর কর্মজীবন বিচিত্র। তিনি কখনো ট্রাক লিজ নিয়ে ব্যবসা করেছেন, কখনো মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ, চলচিত্র শিল্পে সহকারী পরিচালক ও স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে লিপ্ত হয়েছেন, ভিডিও সেট কিনে পার্টনারশিপ-এ ব্যবসা করেছেন। আবার বাবার মৃত্যুর পরে নিজের জমি চাষও করেছেন। তবে তাঁর লেখা লেখিতে যথেষ্ট হাত রয়েছে। ভাস্কর চ্যাটার্জীর দাদু চিন্তাহরণ মুখার্জী (কোর্টের মহুরী) বালুরঘাট নাট্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং মামা সুবোধ মুখার্জী নাট্যমন্দিরের সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ছিলেন। হয়ত নাট্য প্রতিভা তাঁর মাতুলালয় থেকে পাওয়া।

১৯৬৭ সালে পাড়ার নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয়। তিনি প্রথম দিকে কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন কিন্তু তাঁর প্রধানত প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে নাটক লেখা ও গল্প লেখার ক্ষেত্রে। তিনি চলচিত্র জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন দীর্ঘদিন। তাঁর রচিত নাটক গুলি হল-

১. ইয়াহিয়া বধ	-	১৯৭১
২. শেষ রক্ষী	-	১৯৯০
৩. সানাই	-	১৯৯৬
৪. ঘাজানা	-	১৯৯৬
৫. আলকায়দা	-	১৯৯৭
৬. স্বপ্নের দূরবীণ	-	২০০৪

ইয়াহিয়া বধ (১৯৭১)ঃ ভাস্কর চ্যাটার্জীর প্রথম নাটক 'ইয়াহিয়াবধ' ১৯৭১ সালে লেখা। গীতি নাট্যমত ছিল নাটকটি। গ্রামের দুর্গাপূজো মন্ডবে নবমীর দিন অভিনীত হয়। 'ইয়াহিয়া' চরিত্রে তিনি নিজেই অভিনয় করেছিলেন। ৪৫ মিনিটের একাঙ্ক নাটক এটি। নাটকটির

অভিনয় রজনীতে ভোর বেলা পুলিশ নকশালপন্থী হিসেবে ভাস্কর চ্যাটার্জীকে গ্রেপ্তার করেন, দুইদিন পর তিনি মুক্তি পান।

শেষরক্ষী (১৯৯০)ঃ বিখ্যাত জাপানী চলচিত্র পরিচালক আকিরাকুরোসাওয়ার 'কাগেমশা' চলচিত্রের ছায়া অবলম্বনে যুদ্ধ বিরোধী দেশ প্রেম মূলক নাটক হল 'শেষরক্ষী'।

ভাবপুরের রাজা ছিলেন বুদ্ধিমান, বিচারবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শান্তির দূত, সুশাসক। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যেতে পারে সেই জন্য মহামন্ত্রী ও সেনাপতি মিলে দেশ ঘুড়ে হুবহু রাজার চেহারার মত এক চোরকে এনে সিংহাসনে বসান। একথা মহামন্ত্রী ও সেনাপতি ছাড়া জানতেন রাজার পুত্র যে যুদ্ধ প্রিয় ও উগ্র। সে সবাইকে তাচ্ছিল্য করে পার্শ্ববর্তী দেশ বৈশান্ডি দখলের জন্য যুদ্ধে নেমে যায়। কিন্তু যুদ্ধে এক এক করে যোগ দেওয়া সেনাপতির মৃত্যু ঘটে। শেষে রাজপুত্রেরও মৃত্যু হয়। বৈশান্ডির সৈন্যরা রাজপ্রসাদের সিংহাসন দখল করতে গেলে ভিতু কাপুরুষ চোর শত্রু সেনাদের বিরূদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করে।

প্রকৃতি- পূর্ণাঙ্গ, চারটি দৃশ্যে বিভক্ত
চরিত্র- ১৮
ভাষা- চলিত বাংলা ভাষা

সংলাপঃ

রাজপুরোহিত - এ যুদ্ধ বন্ধ কর।
রাজকুমার - আপনি নিজের কাজে ব্যপৃত থাকুন
প্রতিহারী - ওরা যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার করছে।

সেনাপতি - মহারাজা বারুদ ভয়ঙ্কর। এর সামনে আমরা যুদ্ধ করতে অপারাগ।
রাজকুমার - মহাসেনাধ্যক্ষ এবার যুদ্ধের জন্য আমি সেনাপতি চন্দ্রাধীশকে আদেশ দিচ্ছি। (রাজা বাদে সকলে মন্ত্র জপ করতে থাকে অজিত অজিত ওঁ অমিত অমিত)।
রাজকুমার - এ শেষে সেনাপতির নেতৃত্বে যে যুদ্ধ হবে তার তরোবারী মন্ত্রপুত করে সেনাপতির হাতে তুলে দিন যাতে সে এই যুদ্ধে জয় করে ফিরে আসতে পারে।
রাজপুরোহিত- যদি হার হয় মহারাজ?
রাজকুমার - (চিৎকার) রাজপুরোহিত। তার পরিণাম আপনার পক্ষে হবে ভয়ঙ্কর।(পুরোহিত তরোবারী নিয়ে মন্ত্র পড়তে থাকে পড়তে পড়তে আচমকা তরোয়াল নিজের পেটে ঢুকিয়ে দেয়)
সকলে - (চিৎকার) রাজপুরোহিত।
রাজপুরোহিত- (মরণোন্মুখ পুরোহিত) এ যুদ্ধ বন্ধ কর। সভ্যতা ধ্বংসের যুদ্ধে এখনো কেউ জয়ী হয়নি। কোনো দেবশক্তি সভ্যতাঘাতী

যুদ্ধকে সমর্থন করে না। যুদ্ধ বন্ধ কর।

রাজকুমার – (চিৎকার করে এগিয়ে এসে মরণোন্মুখ পুরোহিতের উপরযুপরি তরোবারীর আঘাত করতে থাকে। তরোবারী তার বুক থেকে তুলে নিয়ে সেনাপতির উদ্দেশ্য বলে) এই তরোবারী নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে জয়ী হয়ে ফিরে এসো। (মৃত্যুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে-এইসব নদীর জলে ভাসিয়ে দাও)

ঘাজানা(১৯৯২)ঃ নাটকটি ১৯৯২ সালে যখন লেখা হয় তখন নাম ছিল 'ঘার্জিনিয়া' পরে নামকরণ হয় 'ঘাজানা'। বহু বছর পরে ২০১৭ সালে বালুরঘাট নাট্য একাডেমির প্রযোজনায় ও লেখকের নির্দেশনায় অভিনীত হয়।

কাহিনিঃ এক চলন্ত বাসে এক যুবতীকে চারজন যুবক ধর্ষণ করে খুন করে। পুলিশ প্রশাসন সেটিকে স্বেচ্ছায় সহবাস ও আত্মহত্যা বলে প্রতিষ্ঠিত করে। দু'বছর এক টি.ভি. চ্যানেল তাদের টক্‌শোতে রজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিরোধী নেতা পুলিশ প্রধানের ডেকে এনে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, যে এটা ধর্ষন ও খুন। কিন্তু টক্‌শোতে প্রচারের আলো পাবার আগেই চ্যানেলের সাথে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আপোষ লেনদেন হয়। ঘটনা অপ্রকাশিত থাকে।

প্রকৃতি পূর্ণাঙ্গ- একটি বৃহৎ দৃশ্য।
চরিত্র ২০-২১ জন।
ভাষা চলিত বাংলা ভাষা।

সংলাপঃ

হাইন – দু'হাজার ন'সালে আপনাদের দেওয়া শর্ত মেনে নিচ্ছি। এমনকি ইদ্রের ৬হেক্টর জমিটাও একটা নমিনাল দ্রিমে আপনাদের দেওয়া হবে। তবে তার জন্য সময় চাই।

জিম – কদিন?

হাইন – মিনিমাম ছ'মাস

জিম – ছ-মাসের মধ্যে এটা টেলিকাষ্ট হবে না। নিশ্চিন্তে থাকুন। ভদ্রলোকের চুক্তি। তবে ছ-মাস পরে আপনারা চুক্তি ভঙ্গ করলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে এটা টেলিকাষ্ট হবে।

হাইন – বলছিতো ভদ্রলোকের চুক্তি। এটা যাতে কোনোদিনই প্রকাশ্যে না আসে তার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

জিম – কিন্তু মিসেস জুলিয়া?

হাইন – চিন্তা নেই। উনি আমাদের লোক নির্দেশ মতো বাঘিনী হতেও পারেন আবার দাঁত চেঁপেও থাকতে পারেন বলেই না এত উচু পদ দিয়েছি। যা হোক কাল একবার আমার দফতরে আসুন, না-না পার্টি অফিসে আসুন।

প্রথম অভিনয়- নাটকটি ১৯৯২ সালে লেখা 'ঘার্জিনিয়া' নামে। বহু বছর পর প্রায় ২৪ বছর পর অভিনয় হয় ২০১৭ সালে 'ঘজানা' নামে। 'ঘার্জিনিয়ার' সঙ্গে 'ঘজানার' কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন নাটককার। পাপপাত্রীর নামের পরিবর্তন হয়েছে এবং সময়ের পবির্তন হয়েছে। নাটকটি লেখার সময় ঘটনাকাল ছিল আটের দশকের শেষ কিন্তু অভিনয় সময় ঘটনাকাল ২০০৯ এর। কাহিনি একই থাকছে, কাহিনিকে বিশ্বাস যোগ্য করে তোলার জন্য তিনি ২০০৯ সময়কে নিয়েছেন। কিন্তু নাটককারের ১৯৯২ সালের চিন্তাভাবনার প্রকাশ যেন অপ্রত্যাশিত মিলে যায় নাটকটিতে একটি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে।

সানাই (১৯৯৬)ঃ সানাই নামে একটি দশবছরের মেয়ের একাকিত্ব এই নাটকের মূল বিষয়। সানাই এর বাবা-মা দুজনেই চাকুরে। স্কুল থেকে ফেরার পর একাকিত্ব সানাইকে গ্রাস করে। বাড়ী থেকে ইচ্ছেমত নম্বরে যাকে তাকে ফোন করে সময় কাটায়। এই ভাবে ফোনে একদিন বান্ধবী অজান্তার কাকার সাথে পরিচয় হয়। কর্মহীন কাকা বেড়াতে আসেন। কাকা অজন্তাকে নিয়ে পার্কে যায়, অজন্তার সাথে রুবিকের কিউব নিয়ে খেলে। অজন্তাকে নিয়ে চুপি চুপি ফুচকা খায়। গান পাগল কাকু আজন্তাকে গান শোনায়। সানাই ক্ষিপ্ত হয়ে অজন্তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু কাকার রিং ব্যাকে সানাই উদ্বেল হয়। কাকা সানাইকে ফোনে গান শোনায়। গান শেষ হয়। সানাই এর মা ঘরে ফেরে। জোরে বেল বাজে। পৃথিবীর সব অভিমান জমা হয় সানাই এর মনে- সানাই দরোজা না খুলে কান্নায় ভেঙ্গে পরে।

আলকায়দা (১৯৯৭)ঃ অলোক গোস্বামীর গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়। মানুষের অবিশ্বাস মূল্যবোধহীনতার প্রকাশ ঘটেছে নাটকটিতে।

শিলিগুড়ি শহরের এক সাধারণ বেকার যুবক রিঙ্কু এবং তার সদ্য প্রেমিকা তারই মত সাধারণ এক যুবতি অপু তার মস্তান দাদার অগোচরে প্রেমালাপ করতে এক গোপন জায়গা খুঁজতে থাকে। বন্ধু সন্তোষ যে অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসাদার সে নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে শিলিগুড়ি শহরে এক গুহা জোগাড় করে দেয়। এখনে আশ্চর্যজনক ভাবে রিঙ্কু ও অপু একই গুহাতে সন্ত্রাস শিরোমনি লাদেনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। এদিকে অর্থলোলপ সন্তোষ আরো অর্থের লোভে অপুর খুনি ও মস্তান দাদাকে রিঙ্কু ও অপুর প্রেমের কাহিনি এবং তাদের গোপন আস্তানার কথা জানিয়ে দেয়। অপুর দাদা তার বোনকে উদ্ধার করে রিঙ্কুকে খুন করার উদ্দেশ্যে দলবল নিয়ে গুহামুখে হাজির হয়। অপু নির্দ্বিধায় নিজেকে বাঁচাতে রিঙ্কুকে বাঘের মুখে ফেলে দাদার সঙ্গে চলে যায়। ওসামা বিন লাদেনের মুখোমুখি হয় রিঙ্কু।

বর্তমানে মানবসভ্যতার যেন মূল্যবোধ হীনতার জয়জয়কার। বাস্তববাদীরা সেই মূল্যবোধহীনতাকে স্বাভাবিক (নাটকে যা 'ন্যাচারাল' বলা হয়েছে) বলে বালিতে মুখ গুঁজে চলেছে। আর সেটাই যেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত সত্য। রিঙ্কুর মতন ভাবাবেগপ্রবণদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গুহার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যে নিজের গন্ডিতে সারাজীবন আবদ্ধ থাকবে না গন্ডির বাইরে গিয়ে নিজস্বতার মৃত্যু ঘটিয়ে ওদের দলে মিশে মুক্তির স্বাদ নিতে অপচেষ্টা করবে।

সভ্যতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রেমিক ভাববাদী রিঙ্কু আর সন্ত্রাসবাদী লাদেন দুই ভিন্ন গোত্রের মানুষের অবস্থান একই জায়গায় এসে ঠেকে।

প্রকৃতি – পূর্ণাঙ্ক, ২টি দৃশ্য
চরিত্র – ৪জন
ভাষা – চলিত বাংলা

সংলাপঃ

লাদেন – বিপদের পর বিপদ যখন আসতে থাকে মানুষ খাদের কিনারায় চলে যায়। তখন তার আশ্রয় একমাত্র এই গুহা। এই গুহা ঈশ্বরের ছোঁয়ায় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই- এই গুহাশ্রয়ী কাউকে আঘাত করতে পারে।

রিঙ্কু – আপনি তো সুন্দর বাংলা বলেন।

লাদেন – অতটা সুন্দর না হলেও আপনাদের টিভি সিরিয়ালের ইংরেজী মাধ্যমে পাশ করা নায়ক নায়িকার বাংলা সংলাপের থেকে বেশী শুদ্ধ বলতে পারি। সাক্ষাৎকার দিতে হলেও বাংলা বলতে বলতে ইংরেজীর ঘরে সিঁদ কাটতে হয় না।

স্বপ্নের দূরবীন (২০০৪)ঃ শিশু শ্রমের উপর ভিত্তি করে 'স্বপ্নের দূরবীন' রচিত। গরীব পাথর খাদানের শ্রমিকের ছেলে এক আজব দূরবীন পায়। এই দূরবীনের সাহায্যে সে ভবিষ্যতের অনেক কিছু দেখতে পায়। দূরবীনে দেখার সময় খাদানের মালিক ছেলেটিকে ধরে ফেলে। তাকে চোর সন্দেহে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আদালতে বিচারের সময় বিচারক দূরবীনটি দেখতে পায় এবং দূরবীনটি মালিকের হাতে তুলে দেয় বিচারক। মালিক শ্রীনাথ তার ছেলের চোর ভিখারীর ভবিষ্যত দেখে চমকায়। আরও দেখতে পায় যে তার ছেলে আদালতের কাঠগড়ায় আর বিচারক আসনে সেই শিশুশ্রমিক সুকুমার। মালিক শ্রীনাথের বোধোদয় হয়। সে সুকুমারের লেখা পড়া থাকা খাওয়ার দায়িত্ব নেয়।

প্রকৃতি – একাঙ্ক
চরিত্র – ৬জন
ভাষা – চলিত বাংলা

সংলাপঃ (বিচারালয়ে বিচারের সময় যখন দূরবীন দিয়ে শ্রীনাথ দেখছে)

শ্রীনাথ – আ-আ-আ হায় ভগবান। ও: ও: হুজুর আমার ছেলে গৌরব এগারো বছর বয়স। ক্লাস ফোর এ পড়ে। গৌরব এতবড় হয়েছে।পচিশ বছরের যুবক। একি গৌরবের চেহারা। উগ্র লম্পট, গুন্ডার মতন চেহারা। হুজুর আবার পিস্তল হাতে দৌঁড়াচ্ছে। হুজুর ও খুন করছে- আ: বাঁচান বাঁচান আমার ছেলে বড় হয়ে গুন্ডা হয়ে গেল। ওর বিচার হচ্ছে। একি জজসাহেব কে? এ্যাঁ সুকুমার জজসাহেব (শ্রীনাথ ছুটে গিয়ে সুকুমারের পা চেপে ধরে)

শ্রীনাথ	-	বাঁচান বাঁচান হুজুর। আমার ছেলে খুন করবে না। গৌরব আমার একমাত্র ছেলে। হুজুর ওকে বাঁচান ..... আমাদের গৌরব বড় হবে। অধ্যাপক হবে.....।
জজ	-	আগে আপনার পাপ স্বীকার করুন আমি কথা দিচ্ছি ও যদি ভবিষ্যতে জজ হয় তবে আপনার ছেলেও অধ্যাপক হবে।
শ্রীনাথ	-	(জল মুছে যান তাঁর সামনে) আমি স্বীকার করছি- আমি একজন পাজি দুষ্ট ঐ দূরবীনে যে প্রেত আত্মা আছে তার চাইতে দুষ্ট আমি। আমি সর্ব সামনে স্বীকার করছি এতদিন ধরে এই সুকুমারকে, ওর বাবাকে ঠকিয়ে এসেছি। আজ থেকে সুকুমারকে আমি আমার দাসত্ব, দেনা থেকে মুক্তি দিলাম। শুধু তাই নাই আজ থেকে ওর এবং ওর পরিবারের খাওয়া পড়া সুকুমারের শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব নিলাম আমি হুজুর আমি .....।
প্রথম অভিনয়	-	২০০৪ সালে অভিযাত্রী স্কুলের প্রযোজনায়।

হারাণ মজুমদার (১৯৫৬...)ঃ বালুরঘাটের নাট্যজগতে অভিনতো, পরিচালক নাটককার হারাণ মজুমদারের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ১৯৫৬ সালে ১লা ডিসেম্বরে বালুরঘাটে জন্ম। পিতা বিনয় কুমার মজুমদার, মাতা মীরা রাণী দেবী। মোক্তার পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক, বালুরঘাট খাদিমপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং বালুরঘাট কলেজ থেকে অংক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবনে বহু বিষয় রয়েছে। প্রাইভেট ট্রান্স পোর্ট সাংবাদিকতা ম্যাডিক্যাল রিপ্রেজিনটিভ এর কাজ করেছেন পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের মুরারীপুর হাইস্কুল শিক্ষকতা শুরু করেন।

পরিবারিক ক্ষেত্রে থিয়েটার রেওয়াজ ছিল। সেই সূত্রেই তিনি অভিনয় প্রতিভা পেয়েছেন। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়বার সময় শক্তি প্রসন্ন লাহিড়ীর প্রেরণায় ও পরিচালনায় বিদ্যালয়ে 'পাখির বাসা' নাটকে অভিনয় করেন। যখন তিনি অষ্টম শ্রেণীতে তখন গৌতম সংঘ ক্লাব এর প্রযোজনায় ও বিপ্লব গৌস্বামীর পরিচালনায় করেন 'দাবানল', 'একটি সিগারেটের মৃত্যু', 'নয়ন তারা'। এর পর তিনি নাট্যমন্দিরের সদস্য হল। নাট্যমন্দিরের 'ঝুমুর' 'সূর্যশিকার' 'জুলিয়াস ফুচিক' নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি ও কয়েকজন নাট্যামোদী গড়ে তোলেন 'রূপান্তর' নাট্যসংস্থা। এখানে তিনি 'শূণ্যশতকিয়া', 'নগুয়েন ভেনত্রয়', বিবসনাবৃহনলা', 'শিবের অসাধ্য' 'রামের পালা', 'ইতিহাস কাঁদে', 'সাজানো বাগান' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। রূপান্তর নাট্য সংস্থার শেষের দিকে তিনি যোগদেন 'ত্রিতীর্থ' নাট্যসংস্থায় ১৯৮১ সালে। এখানে তিনি অভিনয় করেন 'তিনবিজ্ঞানী', 'দেবীগর্জন', 'জল', চিরকুমার সভা', 'মন্ত্রশক্তি', দেবাংশী' নাটকে।

১৯৯২ সালে তিনি 'ভারতীয় গণনাট্য সংজ্ঞের বালুরঘাট শাখায় যোগদান করেন। 'ছোটবকুল পুরের যাত্রী', বিষকাজল', 'মহাবিদ্যা', 'যা তারা পারেনি', রত্নাকরের রামায়ণ', 'পালঙ্ক', 'মৃত্যুর অতীত', নাটকে অভিনয় করেছেন।

পথ নাটক করেছেন 'ধাক্কা', 'মশাল', 'ফটোসেশন', 'সামিল', 'ডাকাত এলো দেশে',' বালিশ', 'আমরা করবো জয়', 'জবানবন্দী'। ২০০৫ সালে তিনি গড়ে তোলেন ভারতীয় গণনাট্য সংজ্ঘের শপথ শাখা। এখানে তিনি সমস্ত নাটকের পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন।

নাটককার হারাণ মজুমদারঃ বিভিন্ন সংস্থায় অভিনয় করার পর তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঙ্গের বালুরঘাট শাখায় প্রবেশ করেন। এখানে অভিনয় করতে করতে গণনাট্য শাখার প্রয়োজনেই তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন। বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী হারাণ মজুমদার তাঁর নাটক লেখার কারণ হিসেবে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন-''গণনাট্য মানে একটা লড়াই এর জায়গা, আমি যখন গণনাট্যে এলাম খুব স্বল্প দিনের মধ্যে একটা নির্বাচন চলে আসছিল খুব সম্ভব লোকসভা নির্বাচন। সেই সময় আমাদের গণনাট্যের বালুরঘাট শাখা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। নির্বাচনী নাটকের স্ক্রিপটা কলকাতা থেকে আসত। সেবারও আসবে কিন্তু আসছে না। তখন আমাদের গণনাট্যের জেলা সম্পাদক ছিলেন কিশলয় রায়। তাঁর কাছেও আসেনি। বার বার করে যাচ্ছি, না পাচ্ছি না। আমদের প্রচারে যেদিন বের হবো তার দু'দিন আগে একটি নির্বাচনী নাটকের স্ক্রিপট আসে। সেই স্ক্রিপটে ১০-১২ জন চরিত্র ছিল। ১০-১২ জন চরিত্র নিয়ে নাটক করার মত শক্তি আমাদের ছিল না। পান্ডব মৈত্র আমাকে নাটক লিখতে বলে। তখন আমি রাতে বসে নাটক লেখা শুরু করি। কার্বন কপি করে নাটক লিখলাম। কুমারগঞ্জে যেতে যেতে বাসে দু'জন নাটক পড়ছি। কুমারগঞ্জ গিয়ে রাতে আমি আর পান্ডব রিহার্সল করছি। নাটকটি নাম 'সামিল' (১৯৮৯)''[৮২]। নাটকটি সুনাম হল। এখানে থেকেই তাঁর নাটক লেখা শুরু হল। নাটক লেখার কায়দা কানুন শিখেছেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। ''মাধব মুখোপাধ্যায়ের নাটকের কপি করতে করতেই আমি নাটক লেখার কায়দা শিখেছিলাম। দ্রোণাচার্য মাধবদা, আমি একলব্য।''[৮৩]

প্রথম দিকে তিনি নির্বাচনী নাটক, অ্যাওয়ারনেশ নাটক লিখতে লিখতে, লিখলেন বড় নাটক গুজরাট দাঙ্গার উপর ভিত্তি করে। নাটকটির নাম দিলেন 'লজ্জা'। নাটকটি লিখে - ''আমি ভীতু হলাম আসলে মাধবদা শিখিয়েছিলেন নাটকের মূল জিনিস দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও পরিণতি এই তিনটির মিশ্রণ নাটকে আছে কিনা।''[৮৪]

প্রোসেনিয়াম নাটকে এই বিষয় গুলো অবশ্যই থাকতে হবে, পথ নাটকেও থাকতে হবে। নাটকটি গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের দক্ষিণ দিনাজপুরের সম্পাদিকা শিবানী রায় ও সভাপতি অজিতেশ ভট্টাচার্য এদের সামনে তিনি পাঠ করলেন। নাটকটির পাঠ শুনে তাঁরা আপ্লুত হলেন। এখানে থেকেই তার সাহস বেড়ে গেল এবং তিনি ক্রমাগত নাটক লিখতে থাকলেন। তিনি মোট ১৮টি নাটক লিখেছেন। ২০০৮ সাল পর্যন্ত লিখেছেন ১৪টি নাটক। ১৪টি নাটকের মধ্যে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। ১২টি নাটকের নামের তালিকা দেওয়া হল এবং বিশেষ বিশেষ জনপ্রিয় নাটক গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। হারাণ মজুমদারের নাটক গুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে সমসাময়িক বিষয়, সমাজের নানা রকম কু-প্রথা, কু-সংস্কার, কুকর্ম ইত্যাদি। বাম মতাদর্শের বিশ্বাসী নাটককারের নাটকে রয়েছে রাজনীতির প্রকাশ। নাটক গুলি মঞ্চ এবং পথেও অভিনীত হয়েছে। তাঁর রচিত নাটক গুলি হল-

নাটকঃ

সামিল	-	১৯৮৯
বিষকাজল	-	১৯৯১
ডাইন	-	১৯৯৪
দুই মেয়ে	-	১৯৯৫
যমালয়ে বিতর্কসভা	-	১৯৯৫
ফটো ফিনিস	-	১৯৯৭
একটি সংখ্যা	-	১৯৯৭
গণযাদু	-	২০০৪
আলোয় ফেরা	-	২০০৬
বদনাম	-	২০০৬
পুটলি	-	২০০৮

অনু নাটকঃ

জ্বর - ২০০৮

বিষকাজল (১৯৯১)ঃ মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ রয়েছে নাটকটিতে। পুত্র সন্তানকে নিয়ে বাবা মায়ের গন্ডগোল। বাবা মা দু'জনেই কেউ কারও কাছে ছেলেকে থাকতে দেবে না। একই বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও ছেলেকে বাবার কাছে না ঘেষে তার জন্য মা তার বন্দোবস্ত করেন। কারণ তার স্বামী মাতাল, মাতাল বাবার সংস্পর্শে তার সন্তান খারাব হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্খায় মা সাধুবাবার কাছে যায়। ভন্ড সাধু জল দিয়ে আগুন ধরায়। সেই আগুন ধরানোর পেছনে ছিল রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া। যে স্থানে আগুন ধরানো হয়েছিল সেই মাটি পুড়ে কালো হয়ে গেছে। সেই কালো মাটি কাজল হিসেবে ছেলেকে চোখে পড়ানোর জন্য সাধুবাবা দেয়। দূষিত মাটি শিশু ছেলেটির চোখে ইনফেকশন ঘটায়। শিশু ছেলেটি অন্ধ হয়ে যায়। অন্ধ কুসংস্কারের বসে শিশু সন্তানের চোখ দুটিই নষ্ট করে দেয় তার মা। বাবার সংস্পর্শে হয়ত শিশু সন্তানের চরিত্র গঠন হত না কিন্তু অঙ্গহানী, বিশেষ করে চোখ আমাদের অমূল্য সম্পদ তা নষ্ট হত না।

প্রকৃতি	-	স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক
চরিত্র	-	৫জন
ভাষা	-	দক্ষিণ দিনাজপুররের আঞ্চলিক ভাষা

সংলাপঃ

সাধু বাবা	-	এই নি, নিয়া যা। আতত ভালো করে এই কাজল ছেলের চোখত লগ্গাই দিবু। ব্যাস তলেই কাম হওয়া যাবু যা.....
মা	-	তুমি মোক বাঁচালেন বাবা। তুমি মোক বাঁচালেন। এই বার দেকমো মিন্সা ক্যান কা করে.....।

প্রথম অভিনয় ভারতীয় গণনাট্য সংঙ্ঘের বালুরঘাট শাখার প্রযোজনায় গঙ্গারামপুরে মঞ্চস্থ হয়।

দুই মেয়ে(১৯৯৫)ঃ 'দুই মেয়ে' নাটকটিতে সাম্প্রদায়িকতার বিরূদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে। নাটকটিতে একটি মেয়ে সে গ্রামের প্রধান। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সে মানুষের সব সময় সুখে দু:খে থাকে। প্রধান মেয়েটির মা ভীষণ শুচিবাইগ্রস্থ। শহর থেকে একজন মুসলিম সাংবাদিক মেয়ে সেই প্রধানের ইন্টারভিউ নিতে আসে। মা জানতে পারে সাংবাদিক মেয়েটি বিধর্মী। প্রধানের মা সাংবাদিক মেয়েটির সামনে অভব্য আচরণ করে। মায়ের আচরণে প্রধান মেয়েটি লজ্জিত হয়। কিন্তু সাংবাদিক মেয়েটি বলে যে এটাই স্বাভাবিক। আমাদের ভেতর থেকে অন্ধাকারের মোহ কেটে যায়নি। যতদিন এই মেঘ থাকবে ততদিন এই অবস্থা থাকবে। একদিন জেলা পরিষদের মিটিং এ প্রধাণ মেয়েটি যায় সাথে সাংবাদিক মেয়েটিও থাকে। ফেরার সময প্রধান মেয়েটির গাড়ির সঙ্গে accident হয়। সাংবাদিক মেয়েটি প্রধান মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয় এবং রক্তের প্রয়োজন দেখা দিলে সাংবাদিক মেয়েটি রক্ত দেয়। প্রধান মেয়েটি সুস্থ হলে দু জনেই প্রধান মেয়েটির বাড়িতে ফেরে। মা তার ভুল বুঝতে পেরে দু'জনকেই জড়িয়ে ধরে বলে 'আজ যে মোর এক বেটি নয়, মোর দুই বেটি।'

প্রকৃতি – স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক
চরিত্র – ছয়জন (সকলেই মেয়ে)
ভাষা – দক্ষিণ দিনাজপুরের কথ্য ভাষা
প্রথম অভিনয়– ১৯৯৫, নাটককারের নিজের বিদ্যালয়ে।

একটি সংখ্যা (১৯৯৭)ঃ নাটককে তিনি লোক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মনে করেন। তাই তাঁর নাটকের বিষয় কখনো হয় সাট্টা বা জুয়া কিংবা ডাইনী প্রথা ইত্যাদী। ' একটি সংখ্যা' নাটকটির পটভূমিতে রয়েছে সাট্টা খেলা। এই খেলা একটা নেশার মত। সাট্টা হল Single number এ লটারী লেখা। ১০ টাকা দিয়ে (১-০ পর্যন্ত) ১০টা নম্বরেরর মধ্যে কোন নম্বর ধরে খেলতে পারলে পাওয়া যাবে ১০০ টাকা অর্থাৎ ৯০ টাকা লাভ থাকে। এই খেলায় আক্রান্ত হয়েছে প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষ বেকার, মাষ্টার, ভাইস প্রিন্সিপাল, সরকারী বেসরকারী চাকুরীজিবী, গৃহবধু, পুলিশ প্রায় সকলেই। হয়ত কেউ সরাসরি জড়িত, কেউ আবার সাট্টায় এজেন্ট হয়ে অর্থহীন হয়ে পড়ছে। পরিবারে অশান্তি এই রকম ভাবে সাট্টাকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো পরিবারে নেমে আসছে অন্ধকার। সাট্টার কুফলই নাটককার তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন।

প্রকৃতি – স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক। একটিই বৃহৎ দৃশ্য।
চরিত্র – ২জন প্রধান, তাছাড়াও শববাহক দুইজন এবং বহু সাট্টা আক্রান্ত ব্যক্তি রয়েছে।
ভাষা – চলিত বাংলা

সংলাপঃ

সুরঞ্জন বোস যিনি পুলিশ অফিসার তিনিও সাট্টায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে যমরাজ।

সুরঞ্জন – কি আর বলবো-
যমরাজ – না না মিঃ বোস আপনাকে তো বলতেই হবে-এটাইতো

আমাদের নিয়ম। আর তাছাড়া এতক্ষণ শুনে যা মনে হল তা হল সাট্টা ব্যাপারটা ভয়ানক অপরাধ। আপনারা তো অপরাধ টপরাধ যাতে না হয় সেই জন্যই আছেন।

সুরঞ্জন – সে তো আইনের খাতায় লেখা আছে, কিন্তু .....

যমরাজ – কিন্তু কি,

সুরঞ্জন – অপরাধ যাতে হয় সেটাও আমরা চাই।

যমরাজ – হ্যাঁ সে তো চাইতেই হবে। না হলে আপনাদের তো কোন কাজই থাকবে না।

সুরঞ্জন – তার চাইতে বড় ব্যাপার আমাদের Income ও থাকবে না।

প্রথম অভিনয় – ১৯৯৭ সালে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের প্রযোজনায় রবীন্দ্রভবনে।

ফটোফিনিস (১৯৯৭)ঃ নন্দী গ্রামের আন্দোলনের একটি সাজানো ছবি। শহরের কিছু ছেলেমেয়ে নন্দীগ্রামের তৎকালীন (১৯৯২) শাসকদলের কর্মীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিচ্ছে-খবরের কাগজে এই রকম একটি ছবি বের হয় এবং সেই ছবিটা ছিল সাজানো ছবি। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে নাটককার নাটকটি রচনা করেন।

'ফটোফিনিস' নাটকটি উত্তরণের নাটক। নাটকে দেখা যায় ফুলমনি নামে একজন মহিলা যিনি জমিদার জনার্দনের রক্ষিতা। জনার্দন তার বেনামী সম্পদ হারাবার জ্বালা যন্ত্রণার প্রতি হিংসা স্বরূপ রক্ষিতা ফুলমনিকে দিয়ে কৃষক দরদীদের বিরুদ্ধে একটা কৌশল বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিল। ফুলমনি সমাজের চোখে যতই ঘৃণ্য হোক না কেন নাটকের শেষে তার মানসিক রূপ প্রস্ফুটিত হয়।

প্রকৃতি – স্বল্প দৈঘ্যের নাটক। তিনবার পট পরিবর্তন আছে।

চরিত্র – ১৬জন, চারজন রকবাজ ছেলে।

ভাষা – দক্ষিণ দিনাজপুরের কথ্য ভাষা।

সংলাপ

বিমল – হয় সিদিন আমার জন্মদিন ছিল।

পিষি – হয় হয় তোর মাও পায়স দিয়া মোক সি কথা ক'ল। মুই পায়স খাছি। দাদার ডাক্তারির ঘরে ক্যাংকা চিৎকার চেঁচামেচি। তোর বাপ খালি কছে বিমল বাড়িত নাই-বিমল বাড়িত নাই। চার-পাঁচ জনা ভিতরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খোঁজেছে। মোর আর বৌদির চুলের মুঠি ধরে দাদার গোরোত নিয়া গ্যালি। সফিক ধমকে মোক তাড়ে দিল। দাদা-বৌদির চিৎকার, গুলির শব্দ, দাউ দাউ করে আগুন (সজোরে কেঁদে ফেলে)

বিমল – তাওতো তোমাক বাঁচায় রাখিছে।

পিষি – মোক মারবে ক্যানি। মুই যি জনার্দন জোতদারের রক্ষিতা।

বিমল – তুমি তো একজন রক্ষিতা। আর ওরা ওরা হামাহরের ব্যবাক দ্যাশটাক রক্ষিতা বানাবা চায়। আচ্ছা পিষি খবরের কাগজে

দেখলাম হামাহরের চুলপুরের ব্যাটা ছোল-বিটিছোল হাতোত বন্দুক, পরশুরামের কুড়াল, ট্যাঙ্গী- (পিষি হেসে ওঠে) হাসছেন ক্যান?

পিষি - আরে বাপু শহরের যে মানুষ জন নিয়া আসে সাজে গুজে ফটোক তোলাচ্ছে।

বিমল - কন কি!

পিষি - হয়। মোক নিয়া ফটোক তুলবার চাছোলো । কিন্তু মুই মেলাই ফন্দি করা সটকে পড়িছি।

বিমল - ক্যান যে!

পিষি - আরে বাপু ওমাহারের ব্যবাক কাম জমি ফিরোত পাবার তংকে।

প্রথম অভিনয় - ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পথ নাটক হিসেবে অভিনীত। পরে মঞ্চেও অভিনীত হযেছে।

জ্বর (২০০৮)ঃ 'জ্বর' অনুনাটকটি লেখেন সৃজন নাট্যগোষ্টীর প্রধান রবীন্দ্র নাথ সাহার অনুরোধে। রবীন্দ্র নাথ সাহা নাটককারকে একটি অণুনাটক লিখে দিতে বলে কিন্তু তিনি কখনো আনুনাটক লেখেননি। তাই খুব সদর্পনে 'জ্বর' অনুনাটকটি লেখেন। 'জ্বর' অনুনাটকটি একটি মিথ্যাচারের কাহিনি। তৎকালীন সরকারের বিরোধী পক্ষের প্রচার পদ্ধতি। বেশ কিছু মহিলাকে বাচ্চা সমেত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তারা লোকের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করবে আর প্রচার করবে সি.পি.এম. এর অত্যাচারে তারা বাড়িতে থাকতে পারলো না স্বামীকে মেরে ফেলেছে ইত্যাদি। এই ভাবে তারা সি.পি.এম. এর বিরূদ্ধে প্রচার করেছে।

কাহিনিতে দেখা যায় বিশুর অর্থিক অবস্থা ভালো নয়, বিশুর ছেলে নাকু বছর পঁচিশের ছেলে সে রাজনীতি করে। নিতাই তারও আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাঁর ছেলে অমূল্য রাজনীতি করে। অমূল্য পার্টির প্রচার কাজের জন্য বিশু বৌকে দিয়ে অন্য আর একটি বাচ্চাকে দিয়ে প্রচার কাজ চালাচ্ছে। কাজের শেষে দু'শ টাকা পায়। পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে বিশুর বৌ এবং থানার লকাপে আছে। বিশু তার বৌ কী কাজ করে না জানলেও, তার ছেলে নাকু কিন্তু জানে তার মা কী কাজ করতো।

প্রকৃতি - অনুনাটক

চরিত্র - ৪জন

ভাষা - চলিত বাংলা

সংলাপ

বিশু - আহা চট্‌ছিস ক্যানো। অমূল্য তোর মাকে যে কাজ দিয়েছে তা তো দিনের কাজ। মেয়ে মানুষকে নিয়ে রাতের কাজ সে রকমতো কখনো বলেনি।

নাকু - সব কিছু সবসময় বলা কওয়া করে হয় না। এই যে তুমি অমূল্যদার দেওয়া নতুন লুঙ্গীখানা পড়ে আছো, তোমাকে লুঙ্গী দেবে তা অমূল্য কখনো বলেছিলো। ওই রকম একমুঠো বিড়ি জীবনে

কোনোদিন কিনেছিলে না কিনতে পেরেছিলে? দিন গেলে মা দুইশো টাকা করে প্রতিদিন তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে, কোনদিন ভেবেছিলে? এখন একরাত বউ বাইরে থাকবে তাই নিয়ে চিন্তা। টাকা কামাই করতে গেলে অনেক কিছু করতে হয় আবার করাতে হয়।

বিশু - (নাকুর গালে সজারে একটা থাপ্পর বসিয়ে দিয়ে) থুঃ। ভুলে যাস্‌না আমার বউ তোর মা। নিজের মাকে ছি: ছি ছি ছি ছি:।
(নাকু বাড়ান্দায় বসে। দু' হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে নীরবে কেঁদে ওঠে)

প্রথম অভিনয় ২০০৮, সৃজন নাট্য গোষ্ঠীর প্রযোজনায় নাট্যমন্দিরে।

পুঁটলি(২০০৮)ঃ 'পুঁটলি' মূলত মূল্যবোধে উত্তরণের নাটক। একজন এক পা হারা বৃদ্ধ মানুষ রাতে শহরের এক নির্জন রাস্তার ধারে বেশ কিছুদিন হল রাত কাটায়। বৃদ্ধ লোকটির সম্বল একটা বাঁশের তৈরি ক্র্যাচ আর একটি পুঁটলি। ঘুমোনোর সময় পুঁটলিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায় বৃদ্ধটি। দুই চোর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সে মানুষটিকে অনুসরণ করে কারণ মানুষটি পুঁটলিটি মাথার নিচে না রেখে বুকে জড়িয়ে ঘুমায়। দুই চোরই মনে করে পুঁটলির ভিতর নিশ্চয় দামী জিনিস পত্র আছে। কালক্রমে দুই চোর একত্রিত হয় এবং ঘুমন্ত্য মানুষটির কাছ থেকে পুঁটলিটি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। বিশেষ টানাটানির জন্য পুঁটলিটি খুলে যায়- ছিটকে পরে একটি ছবি, বৃদ্ধটি কেঁদে ওঠে কাতর আবেদন জানায় ছবিটা ফিরিয়ে দেবার জন্য। কারণ ছবিটি ছিল তার ছেলের, যে মাওবাদীর হাতে খুন হয়েছে। মানুষটিও গ্রামছাড়া। দেখা যায় দুই চোরের চোখে জল।

প্রকৃতি- স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক

চরিত্র- চারজন

ভাষা- তিনজন চলিত বাংলা ভাষা কথা বলেছে। বৃদ্ধ দক্ষিণ দিনাজপুরের কথ্য ভাষায় কথা বলেছে।

সংলাপঃ

বৃদ্ধ - ন্যান না বাবু ন্যান না মোর শ্যাষ সম্বল টুকু কাড়ে নেন না। একদিন জোতদারের গুলিতে মোর পাও গেছে তাতে মোর কোনো দু:খ আছিল না। কিন্তু বনপ্যাটির্র গুলিতে যে দিন মোর ছোলটা পরেে ছিল খালি রক্ত আর রক্ত (কান্না)।

প্রথম অভিনয়-২০০৮ সালে শপথ শাখার প্রযোজনায় রবীন্দ্র ভবনে।

ভবেন্দু ভট্টাচার্য (১৯৫৭----)ঃ

অভিনেতা পরিচালক ভবেন্দু ভট্টচার্য ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে আসামের লামডিনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রভাত চন্দ্র ভট্টাচার্য, মাতা হীরণবালা দেবী। চব্বিশ পরগনার গড়িয়া থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ এবং বরদাপ্রসাদ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি দাদার চাকুরী সূত্রে বালুরঘাটে আসেন ১৯৭৩ সালে। এখানে এসে তিনি খাদিমপুর উচ্চ

বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন এবং ১৯৭৯ সালে বালুরঘাট কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে (রসায়ন) স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পরই তিনি বালুরঘাট কলেজে কর্মজীবন শুরু করেন।

তাঁর প্রথম অভিনয় ১১-১২ বছর বয়সে 'সৎপাত্র' নাটকে। 'সৎপাত্র' কবিতাটির নাট্যরূপ দেন বরদাপ্রসাদ হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষক সুবীর বাবু। ভবেন্দু ভট্টাচার্য কবিতার কথকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'রূপান্তর' নাট্যগোষ্ঠীতে ১৯৭৫ সাল থেকে পরিচালনার কাজ শিখতে শুরু করেন। তিনি 'বিবসনাবৃহনলা' নাটকে অভিনয় করেন। তিনি এই সময় ১৯৭৬ সাল থেকে পরিচালনা শুরু করেন। 'ইতিহাস কাঁদে', 'মুচ্‌কিমঙ্গল কাব্য', 'অরুণোদয়ের পথে' প্রভৃতি একাঙ্ক, অমিতাক্ষর (ত্বিষেমপতি) পূর্ণাঙ্ক নাটকের পরিচালনা ও অভিনয় করেন। ১৯৯২-১৯৯৩ সালে 'তূণীর' নাট্যসংস্থায় তিনি 'পদ্মাবতীকথা' অভিনয় ও পরিচালনা করেন।

অভিনেতা পরিচালক ভবেন্দু ভট্টাচার্য দুটি নাটক লিখেছেন-

শোকমিছিল -২০০৭
ঘরকথা -২০১১

শোকমিছিলঃ

ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর ভাঙ্গন এবং সেই সময়ে CPM পার্টিতে পচন বা বেনোজল ঢুকেছিল তার সত্যনিষ্ঠ চিত্র ছিল 'শোকমিছিল' নাটকে। গল্পকার দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 'শোকমিছিল' গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য। অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যুক্তফ্রন্টের পটভূমিতে লেখা শোক মিছিল। ১৯৬৯ সালে CPM এর অনেক তরুণ নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়। 'শোকমিছিল' নাটকে রয়েছে তারই প্রকৃত রূপ।

কাহিনিঃ

নিম্ন বিত্ত পরিবারের কর্তা বিনয় ভূষণ CPM পার্টির পূর্ণসময়ের কর্মী। তাঁর স্ত্রী পারুল, দুই ছেলে অজয় ও বিজয়কে নিয়ে তাঁর পরিবার। CPM পার্টির ভাঙ্গনে অজয় CPM পার্টির পক্ষে থেকে যায় আর বিজয় নক্‌শাল পন্থায় আকৃষ্ট হয়। পারুল একদিকে সততার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু রাজনৈতিক দৃঢ়তার অভাব হেতু বিনয় ভূষণের প্রতি অভিমানী। ছোট ছেলে বিজয়ের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হলেও বিজয় এবং তার সঙ্গের ছেলেদের আত্মত্যাগ ও সততার প্রতি পারুলের নীরব সমর্থন। স্বভাবতই পরিবারের মধ্যে পার্টির ভাঙ্গন এবং সে কারণে যে বিতর্ক, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস এই সব বিনয় ভূষণের পরিবারকে আন্দোলিত ও আলোড়িত করে। অন্যদিকে CPM এর উচ্চ নেতৃত্বে আসীন নীহার ক্ষমতালোভী অসৎ ও কুচক্রী। নীহার নির্বাচনে নিজের স্বার্থে পরেশ নামক একজন অসামাজিক রাজনৈতিক ক্যাডারকে দিয়ে সংগ্রামের নামে বিনয়ভূষণ এবং অজয়ের সঙ্গে বিজয়ের অনৈতিক দ্বন্দ্ব-বাধায়। নীহারের পরিকল্পনায় বিনয়ভূষণের চোখের সামনে দুই ছেলেই খুন হয়। অ্যান্টি সোসাল পরেশ নীহাররের প্রশ্রয়ে এমন অমানবিক কাজ করল। পার্টির এই অধ:পতন আজন্ম অনুগত সৈনিক হিসেবে কাজ করা বিনয়ভূষণ মেনে নিতে পারেননি। প্রকাশ্যে নীহারের সঙ্গে বিতর্ক চালিয়ে বিদ্রোহ করার মত মানসিক গঠনও বিনয়ের

নেই। তাই বিপ্লবের নামে দুই ছেলের হত্যা চোখের সামনে দেখে ক্লান্ত বিধ্বস্ত বিনয়ভূষণ বাড়ি ফিরে স্ত্রী পারুলের কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তি পেতে চায়। কিন্তু পারুল অত্যন্ত দৃঢ়তায় বিজয়ের মৃতদেহ আনতে মর্গে চলে যায়। একা বিনয়ভূষণ মানসিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত পার্টির লোকেদের সঙ্গে অজয়ের দাহকার্যে অংশ গ্রহণ করতে শ্মশানে যেতে অস্বীকার করে। একদিকে CPM তার অত্যন্ত ভালোবাসার পার্টিতে পচন, নীহারের মত মানুষদের আধিপত্য অন্যদিকে নকশাল পন্থায় ব্যক্তিহত্যা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা এটাই সে মানতে পারেনা। তাহলে সমাজ পরিবর্তন ও মানব মুক্তি দিশা কী হবে? নিজের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক অনুশীলনে সমৃদ্ধ বিনয়ভূষণ ডায়রীখুলে লিখতে শুরু করেন।

চরিত্র - ১২ জন
প্রকৃতি - পূর্ণাঙ্গ
ভাষা - শুদ্ধ বাংলা ভাষা

সংলাপঃ

বিনয়ভূষণ:- পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে পার্টি বাড়া মানে গোদের অসুখ। উপর থেকে যতই প্রসারিত বলে মনে হোক না কেন ভেতরে, আরো গভীরে পচা জল। কিন্তু বিজু তার কাছে আমি কার সমালোচনা করব? ও ভুল পথে গেছে।

পারুল:- তাই বলে মিথ্যে বলবে? বলবে এই সত্যি বিপ্লবের সত্যি?

পরেশ:- হোলটাইমার কনসেপ্টাই আমার কাছে বড় গোলমেলে নীহারদা। পার্টির জন্য উনারা কাজ করেছেন, পার্টি পত্রিকায় লিখে রাখুন ওদের কথা। দরকার হলে পার্টি পেনশন দিক।

বিনয়ভূষন- কার কবিতা যেন..... কী যেন ..... সেই লাইনটা - হে ঈশ্বর আমার এমন মৃত্যুর দিয়ো যাতে আমার মৃত দেহের দিকে তাকিয়ে বন্ধুরা তাদের মুখ না ফিরিয়ে নেয়..... কার কবিতা? মায়াকভস্কি নাকি লোরকা?

মনোজ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৬৮----) : অভিনেতা, নাটককার, পরিচালক মনোজ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৬৮ সালের ২৮শে জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা শ্রীমতি মঞ্জু দেবী। কবিতীর্থ বিদ্যাপীঠ থেকে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করে খাদিমপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে বালুরঘাট কলেজ থেকে কলা বিভাগে স্নাতক হন। প্রথমে তিনি গুজরাটের মেডিসিন কোম্পানীতে কাজ করতেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় শিশুশ্রমিক বিকাশ বিভাগে কাজ করছেন। মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাবা নাটক করতেন সেই সূত্রে তিনি শৈশব থেকে অভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করতেন। পাঁচ বছর বয়সে কবিতীর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহজপাঠের অংশ নিয়ে তৈরী নাটকে শিশু শিল্পীর (ছোট খোকা বলে অ আ) ভূমিকায় নাটকে অংশ গ্রহণ। তারপর পাড়ায় অভিনীত বিভিন্ন নাটকে যেমন 'মুখশের অন্তরালে', 'প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদি নাটক অভিনয় করেন ১৯৮৩-১৯৮৪ সাল নাগাদ। তাঁর প্রথম অভিনয় খাদিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাযোজনায় ও অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বিপ্লবী ক্ষুদিরাম'

নাটকের নাম ভূমিকায় ১৯৮৭ সালে। উক্ত নাটকটিতে অভিনয় করার পর তিনি অনুভব করলেন ''নাটক মানে শুধুমাত্র কয়েকটি ডায়লগ মুখস্থ করে বলা নয়। নাটক মানে নিয়মবর্তিতা কঠোর পরিশ্রম। নাটকের প্রতি সত্যতা, ভালোবাসা, অধ্যাবসায়। Light, Music, Set, Props, Stage, Composition এই সব নতুন শব্দ শুনলাম, দেখলাম একজন নির্দেশক এর ভূমিকা। প্রথম বুঝলাম নির্দেশক মানে সবজান্তা মাতব্বর নন। নির্দেশক একজন ভালো বন্ধু এককথায় Friend, Philosopher and Guide ।''[৮৫]

অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ে তোলেন H.R.C.T.G. নাট্য সংস্থা। এই নাট্য সংস্থাটি ১৯৯২ পর্যন্ত নাট্য প্রযোজনা করেছে। এখানে তিনি বেশ কতকগুলি নাটকে অভিনয় করেছেন - 'কে তুমি নিগ্রো,' (রিপোটার), ' আমার ছাব্বিশটা বছর', (পর্যটক), 'গিলোটিন', (বস্তির ছেলে), 'মহেশ' (দেওয়াল), 'দুই বেচারা' (কাজল)।

কলেজে পাঠ গ্রহণের সময় তিনি শিক্ষক হিসেবে পান নাটককার, পরিচালক, অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা, নাটককার, নির্মলেন্দু তালুকদার ও শ্রী সুভাষ চট্টোপাধ্যায়কে। এদেঁর অভিনীত নাটক দেখে তাঁর নাটকের প্রতি আগ্রহ দ্বিগুন বৃদ্ধি পেল। কলেজের অনুষ্ঠানে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনা ও অভিনীত নাটক 'দেবীগর্জন' দেখার পর ''আমার এত দিনের থিয়েটার সম্বন্ধে যে বোধ যে অহংকার তৈরী হয়েছিল তা এক নিমেষে ভেঙ্গে গেল। নিজেকে একে বারেই না জানা জড় পদার্থ মনে হলো। চোখের সামনে মঞ্চে ওপর একজন মহান নির্দেশকের চলাফেরা সমস্ত কুশীলবের মধ্যে তাঁর দক্ষতার ছবির প্রকাশ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। মনে হলো এতদিন কিছুই শেখা হয়নি আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে।''[৮৬]

পার্থ মজুমদার, পার্থ দাস, বাবুল দাস, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, প্রীতম দত্ত, প্রসেনজিৎ ঘোষ, প্রদীপ মান্না - এঁদের নিয়ে মনোজ গঙ্গোপাধ্যায় গড়ে তোলেন 'দর্পন' নাট্যসংস্থা। ১৯৯৩ সালে দর্পনের প্রথম প্রযোজনা রতন কুমার ঘোষের 'সমুদ্র সন্ধানে' নাটকে তার নাটক নির্দেশনার হাতে খড়ি। দর্পন নাট্যসংস্থার সমস্থ নাটক তিনিই পরিচালনা করেছেন এবং বেশির ভাগ নাটকে অভিনয় করেছেন।

'জেলের পাড়ার গান'	-	১৯৯৩ (জেলে)
নাটাখাম্বা	-	১৯৯৪ (মহান্তি মহারাজ)
সিতার অগ্নিপরীক্ষা	-	১৯৯৪ (রাম)
বিরিঞ্চি বাবা	-	১৯৯৫ (নিবারণ)
রামধাক্কা	-	১৯৯৬ (সাধু)
পদধ্বনি	-	১৯৯৬ (কাত্রেভ)
ঠগ	-	২০০২ (বামাপদ)
অসুখ	-	২০০৩ (বৃদ্ধ)
সেঁয়াস অধিবেশন	-	২০০৩ (ভূতনাথ)

২০০৩ সালে পর্যন্ত 'দর্পন' সচল ছিল। তিনি নিজের সংস্থার ছাড়াও অন্যের সংস্থাতেও

অভিনয় করেছেন। ১৯৯৪ সালে তিনি গণনাট্যে যোগদান করেন। গণসংগীতে অংশ নিয়েছেন। গণনাট্য বালুরঘাট শাখায় তিনি করেছেন 'অরাজনৈতিক' (মস্তান), 'আর আঁধারে লয়' (কলেজছাত্র) 'যমালয়ে বিতর্ক সভা' (চিত্রগুপ্ত), 'বিষকাজল' (সুধার চ্যালা), 'মহাবিদ্যা' (স্বর্ণকার), 'মৃত্যুর অতীত' (ডাক্তার), 'পালঙ্ক' (মুকবুল সেখ), 'ফটোফিনিস', 'যবানবন্দী'।

দর্পন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং গণনাট্যের নাটকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রভাবকে মানতেন না পাড়ায় সর্বোপরি নাটকের প্রতি ভালোবাসার জন্য ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থায় যোগদান করেন। যদিও এখানে 'করকুহক' নাটকের মহড়া করেছিল। পরে ত্রিতীর্থও তিনি ত্যাগ করেন। তবে ত্রিতীর্থের সান্নিধ্যের কয়েকদিন তাঁর জীবন গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি স্বীকার করেছেন, ''ঐ কটা দিন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাও বলা যেতে পারে। কারণ খুব কাছের থেকে নাট্য শিক্ষক শ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মত একজন মহান নির্দেশকের গুণাবলী অর্থাৎ সময় সচেতনতা থিয়েটারের প্রতি ডেডিকেশন, চরিত্রায়ণ করার পদ্ধতি, ভয়েস মডিল্যুসন ইত্যাদি আমি দেখেছি এবং শেখার চেষ্টা করে গেছি রপ্ত করতে পারিনি।''[৮৭] দর্পন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ত্রিতীর্থ থেকে চলে আসার কষ্ট তাঁকে Mental Depresion এর মধ্য নিয়ে যায়। এরপর তিনি ২০০৭ সালে নাট্যকর্মীতে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি রক্তিম সাহার নির্দেশনায় 'আলকায়দা' নাটকে মিউজিক চালনার কাজ করেন। বর্তমানে তিনি অভিনয় পরিচালনা করছেন।

অভিনেতা, পরিচালক মনোজ গঙ্গোপাধ্যায় বেশ কয়েকটি নাটক লিখেছেন।

মৌলিক নাটক

ঠক (পূর্ণাঙ্গ) - ২০০২

নাট্যরূপ

পূর্নাঙ্গঃ

বিরিঞ্চি বাবা- ১৯৯৫ (রাজ শেখর বসুর 'বিরিঞ্চ বাবা' গল্প অবলম্বনে)

অসুখ - ২০০৩ (রাজ শেখর বসুর 'অশোক' গল্প অবলম্বনে)

একাঙ্কঃ

সেঁয়াস অধিবেশন- ২০০৩ (রাজ শেখর বসুর 'রামরাজ্য' গল্প অবলম্বনে)

ঠগ: বর্তমান অর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় রাজনীতি ভাঁওতাবাদী, বেকারত্ব এবং 'পেট চালানোর' নামে সহজ জীবিকার মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে 'ঠগ' নাটকটিতে। আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বের একটি ঘটনা 'ঠগ' নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে। কর্মহীন দুই শিক্ষিত বেকার যুবক চাকুরী পাচ্ছে না। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পেট চালানোর এক সহজ উপায় উদ্ভাবন করে। তারা নিজেদের মধ্যে কেউ বাবা, কেউ দাদা, কেউ কাকা সাজে এই ভাবে তারা ছদ্মবেশ ধারণ করে বিভিন্ন জায়গাই কনে দেখে বেড়াই - এই ভাবে তারা খাদ্য অর্জন করছিল। একবার তারা একটি মেয়েকে দেখতে যায়, যে মেয়েটির গায়ের রং কালো। মেয়েটি অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে বলে যে তারা তো তাকে বিয়ে করবে না কারণ এ রকম অনেকেই আসে আবার তারা চলেও যায় যেহেতু তার গায়ের রং কালো। মেয়েটির এই অসহায় কথাতে

দুই বন্ধু সমাজের মূল শ্রোতে ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে থাকে।

অঙ্ক : পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটকটি
চরিত্র: মোট ১২ জন চরিত্র ১০ জন পুরুষ ২ জন মহিলা।
গান: কোন গান ছিল না কিন্তু সুবোধ ঘোষের একটি কবিতা ছিল।
প্রকৃতি: সিরিয় কমেডি ড্রামা।
ভাষা: চলিত বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে।

সংলাপ:

মেয়ের বাবা - তোমাদের ছেলের ব্যবসা কি?
বামাপদ - অ্যাসের বিজনেস।
বাবা - মাহুলী ইনকাম।
বামাপদ - পঁচাত্তর।
বাবা - হাজার, যদিও হাজারের কোনো বাজার নেই।

সেঁয়াস অধিবেশন: সব অভিনীত নাটকই নাটক হয়ে ওঠে না, কোনো কোনো নাটক প্রযোজনা ও অভিনয়ে নাটক হয়ে ওঠে। সেই রকম একটি নাটক 'সেঁয়াস অধিবেশন'। নাটককার মনোজ গঙ্গোপাধ্যায় পরশুরামের 'রামরাজ্য' ছোট গল্পের সূত্রে নিয়ে লেখেন 'সেঁয়াস অধিবেশন'। 'সেঁয়াস' একটি ফরাসী শব্দ যার অর্থ প্ল্যান্‌চেট। প্ল্যান্‌চেট নিয়ে শহরের কিছু বুদ্ধি জীবিদের বৈঠক বা অধিবেশন সেখান রাজনৈতিক নেতা থেকে গৃহভৃত্য মোট আট জন চরিত্র রয়েছে। একজন রিটার্ড জর্জের বাড়িতে প্ল্যানচেটের আসর বসেছে সেখানে রামের বদলে হনুমান চলে এসেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১। নাট্যকার মন্মথ রায়ের জীবনী ও নাট্যসাধনা ড. অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী, প্রকাশক শ্রী অমল দে, ২১/১, গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা-১৪, পৃষ্ঠা-ভূমিকা।
২। 'মধুপর্ণী' নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা, ভাদ্র-১৩৮২, সম্পাদনা- অজিতেশ ভট্টাচার্য, ('বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি'-মন্মথ রায়) পৃষ্ঠা-১১৪-১১৫।
৩। মন্মথ রায় জীবন ও সৃজন-জয়তী ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১২।
৪। 'মধুপর্ণী', নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা-১৩৮২, সম্পাদনা- অজিতেশ ভট্টাচার্য ('বাঙালার সাধারণ মঞ্চ ও আমি'-মন্মথ রায়) পৃষ্ঠা-১১৪।
৫। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১১৫।
৬। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১১৬।
৭। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১১৭।
৮। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১১৮।
৯। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১১৯।
১০। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১২২-১২৩।

১১। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১২১।
১২। পূর্ববৎ (নাটককার মন্মথ রায়কে প্রমথ চৌধুরীর চিঠি-১৩/০৭/২৪) পৃষ্ঠা-১২৩।
১৩। মন্মথ রায় জীবন ও সৃজন- জয়তী ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট (প্রবর্তক-১৩৩১ আষাঢ় সংখ্যা), পৃষ্ঠা-১৩৮ ।
১৪। নাট্যকার মন্মথ রায়: স্মরণ ও মনন -ড. সনাতন গোস্বামী (সম্পাদিত)। প্রজ্ঞা বিকাশ ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, ('মনমথন' এর নাট্যকার মন্মথ রায়- ড. কৃষ্ণ লাল ভট্টাচার্য) পৃষ্ঠা-৬০।
১৫। পূর্ববৎ।
১৬। 'মধুপর্ণী', নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা-১৩৮২, সম্পাদনা-
অজিতেশ ভট্টাচার্য (বাঙলার সাধারণ মজ্ঞ ও আমি' -মন্মথ রায়।) পৃষ্ঠা-১২৬।
১৭। পূর্ববৎ।
১৮। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১২৮।
১৯। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১২৬।
২০। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১২৭('নাচঘর'-৬ই আশ্বিন, ১৩৩৪)
২১। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১২৭ ('আনন্দ বাজার পত্রিকা'-২৬/৯/২৭)
২২। মন্মথ রায় জীবন ও সৃজন-জয়তী ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা, ৭০০০০৯, ('আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৩৩৫, ১২ই জৈষ্ঠ) পৃষ্ঠা-৪৭।
২৩। পূর্ববৎ (কল্লোল পৌষ সংখ্যা)।
২৪। 'মধুপর্ণী', নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮২, সম্পাদনা অজিতেশ ভট্টাচার্য (বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি-মন্মথ রায়) পৃষ্ঠা-১২৯।
২৫। মন্মথ রায় জীবন ও সৃজন-জয়তী ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, (ভগ্নদূত-৩.১.৩১), পৃষ্ঠা-৫২।
২৬। পূর্ববৎ-পৃষ্ঠা-৫২-৫৩
২৭। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-৫৪ (The Bengali-13.02.1931,
২৮। পূর্ববৎ ('আনন্দ বাজার পত্রিকা', ৯.৩.৩১)
২৯। 'মধুপর্ণী', নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮২, সম্পাদনা -
অজিতেশ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-১৩২।
৩০। শ্রদ্ধেয় সত্যরঞ্জন তালুকদার মহাশয়ের স্মরণে 'অনস্থিতের উপস্থিতি'- হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ১৩ই নভেম্বর ২০০৮।
৩১। পূর্ববৎ।
৩২। পূর্ববৎ।
৩৩। সাক্ষাৎকার- প্রণব চক্রবর্তী-০৫.০৯.২০১৫।
৩৪। সাক্ষাৎকার-নির্মলেন্দু তালুকদার-১.৮.২০১৭।
৩৫। ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, চতুর্থ সংখ্যা-২০১২, সম্পাদক-ব্রাত্য বসু, পৃষ্ঠা-১৩০।
৩৬। পূর্ববৎ।
৩৭। শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির ১৯০৯-২০০৮ স্মরণিকা, বালুরঘাট,
দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-২০।
৩৮। পূর্ববৎ।

৩৯। ‘পল্লবিত পঁচিশ বছর ত্রিতীর্থ’, ১৯৬৯-১৯৯৪, প্রকাশক-ত্রিতীর্থ গোবিন্দ অঙ্গন, বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর, (আত্মপক্ষ-হরিমাধব মুখোপাধ্যায়)
৪০। পূর্ববৎ (‘ভাঙ্গাপট’ প্রসঙ্গে -নীহার ভট্টাচার্য)
৪১। ‘দেশ’-৪.১১.১৯৭২।
৪২। ‘বারোমাস’, জুন-জুলাই১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৮৪।
৪৩। সাক্ষাৎকার-হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, ২১.০৬.২০১৬।
৪৪। ‘যুগান্তর’-৩.১১.১৯৮২।
৪৫। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-২০.০২.১৯৮১, অভিজিত সেন।
৪৬। ‘আনন্দ বাজার পত্রিকা’-০৯.০২.১৯৯০।
৪৭। সাক্ষাৎকার-হরিমাধব মুখোপাধ্যায়-২১.০৬.২০১৬।
৪৮। ‘অন্যদিন’ (পাক্ষিক পত্রিকা)-১৫.১২.১৯৮৩।
Govt. of India R.N. 32775/78
৪৯। ‘আনন্দ বাজার পত্রিকা’- ৬.৪.১৯৮৪।
৫০। সাক্ষাৎকার-কমল দাস -১২.০৬.২০১৪।
৫১। পূর্ববৎ ।
৫২। পূর্ববৎ ।
৫৩। ‘দর্পণ’, বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক, শুক্রবার ৬ই মার্চ ১৯৮১।
৫৪। ‘যুগান্তর’-১০.৩.৮৭।
৫৫। সাক্ষাৎকার-কমল দাস-১২.০৬.২০১৪।
৫৬। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, নাটক সমগ্র-১, সম্পাদনা ফণীভূষণ মন্ডল, কথোপকথন-২০১৮, পৃষ্ঠা-xi.
৫৭। সাক্ষাৎকার-হরিমাধব মুখোপাধ্যায়-২১.০৬.২০১৬।
৫৮। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটক সমগ্র-১, সম্পাদনা-ফণীভূষণ মন্ডল, কথোপকথন-২০১৮-পৃষ্ঠাxi.
৫৯। সাক্ষাৎকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়-২১.০৬.২০১৬।
৬০। ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, চতুর্থ সংখ্যা-২০১২, সম্পাদনা-ব্রাত্যবসু, পৃষ্ঠা-১০৫।
৬১। পূর্ববৎ
৬২। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটক সমগ্র-১, সম্পাদনা-ফণীভূষণ মন্ডল, কথোপকথন-২০১৮-পৃষ্ঠা-২৬৯।
৬৩। ৪৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ত্রিতীর্থ-২৬.০৮.২০১৮, পার্থ চৌধুরীর (দামামা) বক্তৃতা।
৬৪। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটক সমগ্র-১, সম্পাদনা-ফণীভূষণ মন্ডল, কথোপকথন-২০১৮-পৃষ্ঠা-xi।
৬৫। সাক্ষাৎকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ২১.০৬.২০১৬।
৬৬। পূর্ববৎ।
৬৭। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটক সমগ্র-১, সম্পাদনা-ফণীভূষণ মন্ডল, কথোপকথন-২০১৮-পৃষ্ঠা-২৬১।
৬৮। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে লেখা মহাশ্বেতা দেবীর চিঠি-২৪.০১.১৯৮০।
৬৯। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটক সমগ্র-১, সম্পাদনা-ফণীভূষণ মন্ডল, কথোপকথন-২০১৮-পৃষ্ঠা-xii।

৭০। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটক সমগ্র-১, সম্পাদনা-ফণীভূষণ মন্ডল, কথোপকথন-২০১৮-পৃষ্ঠা-২৬৯।
৭১। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে তৃপ্তি মিত্রের চিঠি-০৮.০৪.১৯৮৪।
৭২। 'আজকাল'-১৪.০৩.১৯৮৪।
৭৩। 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'-০৬.০৪.১৯৮৪।
৭৪। The Economic Times, Sunday,11.03.1984.
৭৫। 'কলেজ স্ট্রীট', আগষ্ট-১৯৮৪।
৭৬। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটক সমগ্র-১, সম্পাদনা-ফণীভূষণ মন্ডল, কথোপকথন-২০১৮-পৃষ্ঠা-Xii।
৭৭। পূর্ববৎ, পৃষ্ঠা-Xiii।
৭৮। 'দেশ হিতৈষী', ৩১.১০.১৯৮৬, শুক্রবার, ১৩শ সংখ্যা, সম্পাদক- সুধাংশু দাশগুপ্ত।
৭৯। 'বর্তমান'-২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭।
৮০। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটক সমগ্র-১, সম্পাদনা-ফণীভূষণ মন্ডল, কথোপকথন-২০১৮-পৃষ্ঠা-Xiii।
৮১। পূর্ববৎ।
৮২। সাক্ষাৎকার-হারাণ মজুমদার-০২.০৪.২০১৮।
৮৩। পূর্ববৎ।
৮৪। পূর্ববৎ।
৮৫। বালুরঘাট নাট্যকর্মী আয়োজিত স্কুল ড্রামা ফেষ্টিভ্যাল-২০১৫ স্মরণিকা-('নাটক-নির্দেশক ও আমি'-মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়) বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-পৃষ্ঠা-২।
৮৬। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-৩।
৮৭। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-৩।